বৃত্ত

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

একটা সময় পরে জীবনে এমন একটা সময় আসে, যেসময় আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, আমাদের সময়টা আমাদের নয়। আর যা আমাদের নয়, তার জন্য আমরা প্রচুর সময় অযথা নষ্ট করেছি। একটা সময় পরে জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা বুঝি এবার সেই সময় এসেছে যখন আমাদের পুরনো সময় থেকে নিজেদের বের করে নতুন একটা সময় শুরু করতে হবে। ছেড়ে রাখা একটা বৃত্তকে আমাদের নিজেদেরই সম্পূর্ণ করতে হবে। বুঝি প্রথম প্রেমিক, দ্বিতীয় চাঁদ, তৃতীয় ছাগল ছানা বা চতুর্থ বাঁদর হয়ে

বেঁচে থাকার চেয়ে পঞ্চম বিটল্‌স হয়ে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে এবার। বুঝি সময় এসেছে একটা নতুন গল্প শুরু করার। একটা পজিটিভ, ফিল গুড, বৃত্তাকার গল্প। যা পড়ে কোনও ন কোনও ফিল্ম ডিরেক্টর অন্তত আমার কাছে আসবেন আর এসে কয়েক লক্ষ টাকায় সেই গল্পের রাইট কিনে একটা রঙিন হিন্দি ছবি বানাবেন। আর বোঝাবেন, আমার এই শাল পাতা বা মাটির ভাঁড়ের মতো জীবনও ততটা ফালতু বা অদৃশ্য নয়। বোঝাবেন, এই দিয়ে কোনও বুদ্ধুর গল্প না হলেও একটা পঞ্চম বিটল্‌সের গল্প বলা যেতেই পারে।

তবে তার আগে বোবো, মানে যার ভাল নাম বৈষ্ণবী, তার গল্প।

বোবোর গল্প

প্রথম ভাগ

বোবো যখন ছোট ছিল বোবোর মা বলত, "বোবো, বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও।" বোবো যখন ছোট ছিল বোবোর বাবা বলত, "বোবো, বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও।" বোবো যখন ছোট ছিল বোবোর টিচার বলত, সরি, বলতেন, "বোবো, বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও।" বোবো যখন ছোট ছিল সবাই তখন বলত, "বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও।"

বোবোর মনে হত, পৃথিবীটা আসলে এক বিরাট প্রশ্নমালা আর সবাই কুইজ মাস্টার। তাই কোন কথার কোন উত্তরটা দেবে ঠিক বুঝতে পারত না ও। আর ভাবত, একজনও কি নেই যাকে উলটে বোবো এই কথাটা বলতে পারে, "বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও!"

না, কেউ ছিল না তেমন। ওদের এই বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালে বোবোর মনে হত, ও বোধহয় তিমিমাছের পেটে বেঁচে আছে! চারদিকে ঘুরে বেড়ানো দশ-বারোজন কাজের লোককে দেখলে ওর মনে হত, সবাই বুঝি রোবট! মনে হত, ওদের নড়াচড়া থেকে ধাতব আওয়াজ আসছে! বোবোর থতমত লেগে যেত। বাবা, মা বা দিদির দিকে তাকালে মনে হত, এরাও ওরকম যন্ত্র নয় তো?

একবার ঘুমন্ত মায়ের নাকের ভিতর পেনসিল ভরে ও দেখতে চেয়েছিল ভিতরে লোহার যন্ত্রপাতি আছে কি না।

মা তো ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করে তিমি মাছটাকে একদম মাথায় করে তুলেছিল। বাবা পাশের স্টাডি থেকে ফারের জুতো পরে রাগী পায়ে দৌড়ে এসে বোবোকে বলেছিল, "এ কী করেছ তুমি? মাকে কী করেছ?"

ছোট্ট বোবো বাবার কোমরের কাছ থেকে ঘরের সিলিং দেখার মতো মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। কোনও কথা বলতে পারছিল না। কারণ বোবো ভাবছিল, মায়ের নাকের ভিতরে পেনসিলটা ঢোকানোর সময় ও ঠং করে একটা শব্দ শুনেছিল যেন! ভাবছিল, তবে কি মা সত্যি... মানে, বাবা কি কোনওবার জাপানের কোনও দোকান থেকে মাকে কিনে...

"বোবো," বাবার চিৎকারে তিমি মাছটা এবার যেন চোখ খুলে তাকিয়েছিল, "বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও!"

মা-বাবার দাপাদাপি আর চিৎকার চলছিল। কিন্তু প্রথম দেড়মিনিটের পর বোবোর কানে কিছু যাচ্ছিল না।

সেই প্রথম বোবো বুঝেছিল, জীবন থেকে শব্দকে বাদ দিয়ে দিলে অনেককিছুই হাস্যকর আর সামান্য হয়ে ওঠে। বুঝেছিল, শব্দ বাদ দিয়ে দিলে জীবনটাকে আর ঠিক ততটা খারাপ লাগে না। সেই ছোটবেলাতেই বোবো বুঝেছিল শব্দদূষণ কাকে বলে!

শুধু একজন বোবোকে এমন রোবট ভাবত না। সে হাসত। বোবোকে কোলে নিত। আদর করত। আর চকোলেট কিনে দিত। সে বোবোর বেস্ট ফ্রেন্ড। নাঙু।

বাবার দূর সম্পর্কের খুড়তুতো দাদা, নাঙু। ডাকনাম রাঙা কিন্তু ছোট্ট বোবো উচ্চারণ করতে পারত না, বলত, নাঙু। ছোট থেকেই নাঙু ওদের বাড়িতে থাকে। বাবা-মা কেউ নেই নাঙুর। বোবোর ঠাকুরদা নাঙুকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে নাঙু এখানে। বোবোদের কোম্পানির ডিরেক্টরের পদ থেকে রিটায়ার করলেও বোবোদের বিজনেসে ভীষ্ম হয়ে এখনও নাঙু বোবোর পিছনে। বোবোর বাবা মারা গিয়েছে দু' বছর আগে। মা মারা গিয়েছে তারও আগে। বোবোর দিদির বিয়ে হয়েছে বাবা বেঁচে থাকতেই। জামাইবাবু মানুষটা বেশ ভাল। তবে বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকেন।

বোবোদের গোটা বিজনেসের ভারটাই এখন বোবোর উপরে। আর সেটাও যেমন তেমন বিজনেস নয়, খুব বড় ব্যবসা। প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকার টার্নওভার। বাবার মৃত্যুর পর দিদি তো ভেবেছিল, বোবো পারবে না সামলাতে। কিন্তু নাঙু বলেছিল, ঠিক পারবে। বছর দুয়েক তো কোম্পানিতে কাজ করছে বোবো, ও ঠিক পারবে। বলেছিল, "আর আমি তো আছিই!"

তা আছে। নাঙু সত্যিই আছে। বোবোর এই উনত্রিশ বছর বয়স অবধি বোবোর সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে নাঙু আছে। এই যে আজ ২৯ ফেব্রুয়ারি, বোবোর জন্মদিন, আজ সকালে প্রথম ফোনটা করেছিল তো নাঙুই। ওদের বড় বাংলোটার একদম অন্যমাথায় লনের ওপাশে নাঙুর তিনকামরার ঘর। সেখান থেকে জন্মদিনের উইশ করে নাঙু বলেছিল, "তুই কি এখনও ঘুমোচ্ছিস নাকি? ওঠ, অফিসে যাবি না? পঞ্জাব থেকে কিন্তু ওই টেক্সটাইলের লোকদের আসার কথা। আর দেরি করিস না।"

জন্মদিন নিয়ে বোবোর কোনও ফ্যান্টাসি নেই। এটা ওর কাছে আরও একটা দিন, তবে নিনি খুব আদিখ্যেতা করে। বলে চারবছরে একবার করে আসে দিনটা, অত অবহেলা করতে নেই। কেবল এটা ভাবলেই বোবোর বেশ মজা লাগে। লোকের বছরে-বছরে বয়স বাড়ে আর ওর চারবছরে বয়স বাড়ে একসঙ্গে। আজ সেই একসঙ্গে বয়স বাড়ার দিন। ঠান্ডা এখন গিয়েও যাচ্ছে না। স্নান সেরে শার্ট-ব্লেজার গায়ে চড়ালেও বোবোর হালকা শীত লাগছে।

ওর বেডরুমটা দোতলায়। সঙ্গে একটা চওড়া ব্যালকনি আছে। বোবো এসে দাঁড়াল ওখানে। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। অন্যদিন এমন সময় ও অফিসে চলে যায়। কিন্তু আজ একটু আলসেমি লাগছে। কাল বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। প্রায় দেড়টা। আসলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওই হাউজিং প্রজেক্টটা নিয়ে খাটনি যাচ্ছে খুব। এমনিতেই ওখান থেকে এই আলিপুরে পৌঁছতে প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগে। তার উপর কাল সোয়া বারোটা নাগাদ ও সাইট ছেড়ে বেরিয়েছিল। বাড়ি পৌঁছতে যে রাত দেড়টা হবে এতে আর আশ্চর্য কী!

আজ সকালে বেশ কুয়াশা আছে। ব্যালকনির সামনেই বড় লন আর তার ওদিকে নাঙুর ছোট্ট বাড়িটা কেমন যেন তেল কাগজের ওপাড়ে দেখা ছবির মতো লাগছে। একসময় এই বাড়িতে কত মানুষের ভিড় ছিল। কিন্তু এখন সব কেমন যেন ফাঁকা! বাড়িটা আজ বড্ড বেশি খাঁ-খাঁ করছে। একটা বহুদিন পিছনে ফেলে আসা মুখ খুব মনে পড়ছে ওর। ছোট্ট টুনটুনির মতো একটা মনখারাপ লাফাচ্ছে এই ডাল থেকে ওই ডালে। যেন উড়ে গিয়ে বসছে পাশের ঝুমকো লতার ঝোপে। মনখারাপ হচ্ছে, মনটা বেশ খারাপই হচ্ছে।

বোবো ছেলেদের মতো করে কাটা চুলের ভিতর আঙুল ডোবাল। সামান্য ভিজে আছে চুলটা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যালকনি থেকে ঘরের দিকে ফিরল। আর ফিরেই দেখল নিনি ঢুকছে ঘরে। বোবোর চারবছর বয়সে নিনি এই বাড়িতে এসেছিল। তখন নিনির বয়স পঁচিশ। তারপর থেকে বোবোর সমস্ত দায়িত্ব নিনি আজও পালন করে চলেছে। মা যত না বোবোকে শাসন করেছে, নিনি তার দশগুণ শাসনে রাখে বোবোকে। কিছু বললেই বলে, "তুই বাচ্চা মেয়ে, তুই বুঝিস কী রে!"

নিনির বিয়ে হয়েছিল আঠেরো বছর বয়সে। কুড়িতেই নিনি বিধবা। আর পঁচিশ থেকে তো নিনি এই বাড়িতেই।

বোবো মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করে, "নিনি, তুমি তো আবার বিয়ে করলে পারতে। করোনি কেন?"

নিনি বলে, "এসব কী কথা? বিধবাদের বিয়ে করতে হয় নাকি?"

বোবো হাসে, বলে, "কোন সেঞ্চুরিতে পড়ে আছ তুমি?

বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ? তিনি বিধবা বিবাহ শুরু করিয়েছিলেন, জানো?

নিনি হাসে, "বিদ্যাসাগর? মানে পাহাড়ি সান্যাল? আমি গ্রামের মেয়ে, পড়াশোনা শিখেছি যে জানব এসব! আর জেনে কী হবে আমার? আমি বিয়ে করলে তোর কী হত? কে সামলাত তোর হাজারও ঝক্কি? আমার কি আর বিয়ে করার উপায় ছিল!"

এই মানুষটাকে বোবোর খুব ভাল লাগে। ছোটবেলার মতো এখনও মাঝে-মধ্যে নিনির ঘরে চলে যায় রাতে। নিনির ছোট্ট খাটটায় গুজিমুজি করে শুয়ে পড়ে নিনিকে জড়িয়ে ধরে। চন্দন, লবঙ্গ আর এলাচের মতো একটা গন্ধ মিলেমিশে থাকে নিনির সঙ্গে। চোখ বন্ধ করে নিনিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে বোবোর মনে হয়, আবার ছোট্ট হয়ে গিয়েছে, আবার হালকা একটা তুলো ফুচকি পাখি হয়ে গিয়েছে ও।

"কী রে অফিস যাবি না?" নিনি ভুরু কুঁচকে তাকাল।

"কী ব্যাপার বলো তো?" বোবোও পালটা ভুরু কোঁচকাল, "তোমরা সকলে মিলে আমায় অফিস পাঠাতে চাও কেন?"

"মানে? রোজ এসময়ে তো অফিসে চলে যাস। আজ যাসনি, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

বোবো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "যেতে তো হবেই।"

নিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বোবোর দিকে। তারপর বলল, "কী হয়েছে তোর? এমন গলায় কথা বলছিস কেন? মন খারাপ? জন্মদিনে মন খারাপ করতে নেই!"

"মন?" বোবো হাসল, "বাদ দাও। চলো খেয়ে নিই।"

নিনি কিন্তু নড়ল না, "হবে না? মনের আর দোষ কী? খারাপ হতেই পারে। উনত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল। তোর বান্ধবীরা সব এখন বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে দৌড়চ্ছে। আর তুই? বিয়েটা পর্যন্ত করছিস না!"

"কাকে করব?"

"সেই, কলকাতায় তো ছেলেদের আকাল পড়েছে, তাই না? আরে বাবা, তোর বয়ফ্রেন্ডটাই তো আছে। তাকেই কর না বিয়ে।"

"কে? ইকজ্যোৎ?"

"হ্যাঁ, ওই তোর ইক্কি," নিনি এমন করে বলল যেন গলায় কাঁটা ফুটছে।

বোবো হাসল, "ভূতের মুখে যে রামায়ণ শুনছি? তোমার আবার ইক্কিকে কবে থেকে পছন্দ হতে শুরু করল? তুমি চাও আমি ইক্কিকে বিয়ে করি?"

"আমি?" নিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, "আমি তোদের বাড়ির ঝি তো। আমার চাওয়া না চাওয়ার উপর কিছু কি নির্ভর করে?"

বোবো নীচে নামতে গিয়েও থমকে গেল। তারপর পিছন ফিরে জড়িয়ে ধরল নিনিকে। হেসে বলল, "কতবার বলেছি সন্ধেবেলা বসে ওই সিরিয়ালগুলো দেখো না। তুমি শুনবে আমার কথা? তুমি আর সাধারণভাবে কথা বলো না, সবসময় ডায়ালগ দাও। কী কথা হচ্ছিল, আর কী কথায় চলে গেলে!"

নিনি বলল, "ছাড় আমায়, খেতে চল। আজ জন্মদিন বলে পায়েস করিয়েছি।"

"আমায় উইশ তো করলে না।"

"ন্যাকামি করিস না। তুই এসব যেন কত মানিস! সকালে উঠে মন্দিরে তোর নামে পুজো দিয়েছিলাম। একটা ধাগা বেঁধে দেব।"

"কাম অন নিনি," বোবো এবার বিরক্ত হল, "আবার এসব শুরু করেছ? বলেছি না আমার এসব ভাল লাগে না। ঠাকুর-টাকুরে আমার বিশ্বাস নেই।"

"তো কীসে বিশ্বাস আছে তোর? দেবতায় নেই তো দানবে বিশ্বাস আছে?"

বোবো এবার নীচে নামতে শুরু করল। নিনি তবু ছাড়ল না, "পালাচ্ছিস কেন? আমি কী জিজ্ঞেস করছি?"

"নিনি প্লিজ," খাওয়ার ঘরের দিকে যেতে-যেতে বোবো বলল, "ভগবান নিয়ে আমি তর্ক করব না।"

"ভগবান নয়, বিয়ের কথা বলছি।"

বোবো রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল, "তুমি সত্যি ভগবানের একপিস ক্রিয়েশন। কীভাবে কথা জাম্প করতে পার!"

নিনিও হাসল এবার, "এই তো ভগবানের কথা বলছিস! তা ইক্কির সঙ্গে এক্কা-দোক্কাটা খেলে নিলেই তো পারিস।"

বোবো কিছু বলতে গিয়েও পারল না, কারণ বড় হল থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, "আরে আমার কথা বলছ নাকি তোমরা?"

বোবো দেখল, ইকজ্যোৎ ঢুকছে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, স্ট্রবেরি-ভ্যানিলা-টু-ইন ওয়ান আইসক্রিমের মতো গায়ের রং। থ্রি কোয়ার্টার করে গোটানো সাদা ফুলশার্টের সঙ্গে ডার্ক ব্লু কটন প্যান্টস-এ পুরো খুন-খারাপি দেখতে লাগছে ইক্কিকে।

হ্যাঁ, বোবোকে ইক্কির মার্কেট রেটিং অন্য মেয়েদের রিঅ্যাকশন দেখে নিতে হয়, কারণ বোবো নিজে বোঝে না। ইক্কিকে দেখে বোবোর কিচ্ছু হয় না। বরং একটা বেয়ারা টুনটুনি কেবলই ঝুমকো লতার ঝোপের মাথায় ওড়াউড়ি করে। মন খারাপের হাওয়া এসে ওর বুকের ভিতরের পরদাগুলো খুব করে ওড়ায়! কে যেন একটা ছোট্ট বিড়ালছানা কোলে নিয়ে একা-একা হাঁটে নির্জন ফুটপাথে।

নিনি চাপা গলায় বলল, "নে তোর বুলডোজার চলে এসেছে।"

ইক্কি এসে ডাইনিং টেব্‌লের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, "নাত্তে মে কেয়া হ্যায়?"

"তুমি অফিস যাওনি?" বোবো ইক্কির উলটোদিকে বসল।

"না, বাট আই উইল।"

"তবে এখন বাড়িতে এলে?"

"তোমাকে মোবাইলে পেলাম না। তাই নাঙুকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায়। বাড়িতে জেনে চলে এলাম।"

"কেন? উইশ করতে এলে?"

"উইশ?" ইক্কি থতমত খেল, "মানে?"

"কিচ্ছু না," বোবো অল্প হাসল।

"অ্যায়াম হিয়ার ফর সাম সিরিয়াস বিজনেস। বাবার একটা প্রপোজাল নিয়ে এসেছি।"

বোবো দেখল নিনির সঙ্গে আরও তিনজন কাজের মহিলা খাবার নিয়ে আসছে। ও জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"ডোঙারিয়ার ওখানের জমিটা তুমি আমাদের ছেড়ে দাও।"

"মানে?" বোবো বিরক্তিটা লুকোল না।

"মানে আবার কী?" ইক্কি হঠাৎ রূঢ় গলায় বলল, "ছেড়ে দাও মানে ছেড়ে দাও। ওটা আমাদের কাজে লাগবে।"

"আরে, এমন করে বলছ কেন? আমিও তো কিনব আমার কাজে লাগবে বলেই," বোবো অবাক হল।

ইক্কির মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, "ডোন্ট কোয়েশ্চন মি। যা বলছি করো। অর এলস..."

বোবোর গলাটাও শক্ত হল এবার, "অর এলস?"

ইক্কি কঠিন গলায় বলল, "অর এলস আমি ভুলে যাব যে, আমরা এনগেজ্‌ড।"

২

গাড়িটা বেশ বড় আর নরম। পিছনের সিটে বসে পা অনেকখানি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। লেগ স্পেসও প্রচুর। আর তার সঙ্গে সিটগুলোও রিক্লাইনিং। খুব দামি এই গাড়িটা। প্রায় পঁচাত্তর লাখ টাকা। এত দাম দিয়ে গাড়ি কিনতে চায়নি বোবো। কিন্তু নাঙু ছাড়েনি। বলেছিল, "আরে, নিজের জন্য তো কিছু করবি। তা ছাড়া, তোর একটা স্টেটাস নেই? জানবি সকলেই মালিকদের একটু অন্যভাবে দেখতে চায়। ইংরেজি অনার্স পড়েছিলি, বার্নাড শ পড়িসনি? কিনবি, এই গাড়িটাই তুই কিনবি!"

গাড়িটা যখন চলে, এই কলকাতার রাস্তাতেও একফোঁটা ঝাঁকুনি লাগে না। এককাপ ভর্তি চা হাতে ধরে বসে থাকলেও বোবো জানে

এক ফোঁটাও চলকাবে না। কেনার সময় ওর একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব ছিল, তবে আর তা নেই। বরং গাড়িটা বোবোকে যেন টানে! নিজেকে কেমন যেন পোষা মনে হয় গাড়িটার কাছে।

আজ নাঙু অফিস চলে গিয়েছে জলদি। সেদিন পঞ্জাব থেকে যারা অফিসে এসেছিল মিটিং করতে, তাদের একজন রিপ্রেজেনটেটিভ আসবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর নাঙুর মিটিং আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজে ওদের লাক্সারি হাউজিং প্রজেক্ট, 'আর্কটিক ভিলেজ'-এর যারা অ্যাড ক্যাম্পেনিংয়ের দায়িত্বে রয়েছে, তাদের সঙ্গে। এসব সেরে সেকেন্ড হাফে নাঙু আসবে বজবজে।

বোবোর আজ তেমন কাজ নেই। মানে ওর কী হয়েছে আজকাল কে জানে, কাজ করতেই ইচ্ছে করে না। সেই যে জন্মদিনের সকালবেলায় আচমকা ওর মনের ভিতর ঘুমিয়ে থাকা টুনটুনিটা জেগে উঠল, তারপর থেকে তার নাচ থামার কোনও নাম-গন্ধ নেই। বাড়ি থেকে আজ দশটার পর বেরিয়েছে ও। মনে-মনে হিসেব করে নিয়েছে যে, নাঙুর বজবজের সাইটে আসতে বেলা দু'টো-আড়াইটে হবে। তার ভিতরে ওখানে পৌঁছলেই হবে। তার আগে একবার কলেজ স্ট্রিট যেতে ইচ্ছে করছে বোবোর। অনেকদিন বইপত্তর কেনা হয়নি। আজ একবার পায়ে হেঁটে বইপাড়ায় ঘুরবে।

আসলে আজ মনটা পালাই-পালাই করছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ভেবেছিল বজবজের গঙ্গার পাশে একটু বসে থাকবে নির্জনে। কিন্তু তারপর আচমকাই বইপাড়াটা ওকে কেমন যেন টানল! কিন্তু চারদিকের এমন গায়েপড়া ধরনের ভিড় দেখে এখন টেনশন হচ্ছে বোবোর। গাড়িটার না কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!

টি টি শব্দে আচমকাই ফোনটা নড়েচড়ে উঠল। দু'টো অফিসের কাজের জন্য। আর-একটা প্রাইভেট। আজ অফিসের কাজের জন্য রাখা ফোন দু'টো বন্ধ করা আছে। আর এই ফোনের নম্বরটা দু'-চারজনের কাছেই আছে। ফোনটা বের করে বিরক্তিটা আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল। ইক্কি। ছেলেটার সঙ্গে যে কী কুক্ষণে আলাপ হয়েছিল ওর! এখন আফসোস হয়। সেদিন জমি নিয়ে এমন শুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত প্রায় জোর করে কথাটা ঘুরিয়েছিল বোবো এই বলে যে, জমি পেতে এখনও অনেক দেরি। ও পরে ভাববে।

"হ্যাঁ, বলো," গলাটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বলল বোবো।

"আরে কহাঁ হো তুম? ওই ফোন দু'টো বন্ধ কেন?"

"তোমার কি কিছু বলার আছে?"

"ফার্স্ট ইউ আনসার মি। কোথায় তুমি?"

"আমি একটু কলেজ স্ট্রিট যাচ্ছি।"

"কিঁউ? হঠাৎ কলেজ স্ট্রিট কেন?"

"বই কিনব কিছু। বহুদিন কিছু পড়া হচ্ছে না। তাই ভাবলাম।"

"মানে?" ইক্কির গলা চড়ল, "তোমার কী হয়েছে বোবো? হোয়াই আর ইউ বিহেভিং সো স্ট্রেঞ্জলি? মন দিয়ে অফিস করছ না, ফোন অফ রাখছ, বই পড়বে বলে কাজের সময়ে কলেজ স্ট্রিট যাচ্ছ! কী হয়েছে তোমার?"

"এমন চেঁচাচ্ছ কেন?"

"বা রে, আমি বলব না? এত অমনোযোগী হলে বিজনেসের কী হবে?"

"আমার কাজ আমি ঠিক সামলে নেব। তুমি বলো কেন ফোন করেছ?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল ইক্কি। তারপর বলল, "আমাদের যে পঞ্চাশ হাজার শার্ট তোমার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে, সেটা বাহাইন্ড শেডিউল যাচ্ছে। এটা নিয়ে তুমি কী করছ?"

"বাহাইন্ড শেডিউল? তাই?"

"বাহ্," ইক্কি চিৎকার করল আবার, "হাউ ইরেসপনসিবল! আরে তোমার ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, তাও তুমি জানো না? দেড়লাখ শার্টের অর্ডারটা পেয়ে তোমায় যখন বললাম ফিফটি থাউজ্যান্ড শার্ট তোমাদের তৈরি করে দিতে হবে, তখন তো বললে নো প্রবলেম আর এখন আকাশ থেকে পড়ছ! আরে এরা ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্ট। খুব শক্ত এলডি ক্লজ আছে লেটার অব ক্রেডিটে। আমার তো পুরো বাল্লু হয়ে যাবে। আর তুমি বলছ তাই!"

বোবো বুঝল এটা একটা ভুল হয়ে গিয়েছে ওর। আসলে গত দু'দিন প্রগ্রেসটা দেখা হয়নি। ফলে ফ্যাক্টরিতে 'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর' অবস্থা! প্রডাকশন ম্যানেজারের খবর নিতে হবে। পঞ্চাশ হাজার শার্ট এমন কিছু ব্যাপার নয়। আসলে ইক্কিদের ফ্যাক্টরিতে মেশিনারিজের একটা বড় পার্ট বসে গিয়েছে! তাই ও হেল্প করছে। কিন্তু এখন ইক্কি যা বলছে, তা যদি সত্যি হয় তবে তো মুশকিল।

বোবো বলল, "তুমি জানলে কী করে যে কাজ ভাল হচ্ছে না?"

"আরে, আমি নিজে তোমার ফ্যাক্টরিতে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার প্রডাকশন ম্যানেজার বলছে যে, আর্জেন্তিনা না কোন একটা সাউথ আমেরিকান কান্ট্রি থেকে আসা অর্ডারটা আগে শেষ করতে হবে। নাঙু নাকি বলেছে। এটা কি মাজাকি হচ্ছে? মারনে কে লিয়ে ক্যায়া ম্যায় হি থা? ওই নাঙু মালটা একনম্বরের শয়তান। বিজনেসে আমরা সবাই কম্পিটিটর। কিন্তু বিপদে পড়লে তো একে অপরকে হেল্প করি, তাই না? তুমি বললে আমায় হেল্প করবে আর এখন আমার কাজ ঝুলিয়ে আমায় আর্জেন্তিনা দেখাচ্ছ!"

একে অপরকে হেল্প! হাসি পেল বোবোর। ও তো মনে করতে পারছে না কবে ইক্কিরা ওর কোনও কাজে হেল্প করেছে! বরং ইক্কির বাবা বলবীর সহানি সুযোগ পেলেই বোবোদের বিপদে ফেলতে চায়। বোবো জানে, গোঁড়া পঞ্জাবি পরিবার হওয়া সত্ত্বেও ওরা বোবোর সঙ্গে ইক্কির বিয়ে দিতে চায় শুধুমাত্র এই বিজনেসের জন্য।

ইক্কি চিৎকার করে আরও কিছু বলছে। কিন্তু বোবো ফোনটা কান থেকে সরিয়ে নিল। কী কুক্ষণে যে ইক্কির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওর!

বছর চারেক আগের ব্যাপার সেটা। টেক্সটাইল মেশিনারিজ বিক্রির জন্য চিন থেকে একটা কোম্পানি এসেছিল। এক বিখ্যাত ফাইভস্টারে সেমিনার কাম ডিনারের আয়োজন করেছিল। সেখানেই বোবোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ইক্কির।

ঘরের একটা কোনায় ওয়াইনের গেলাস হাতে নিয়ে একা দাঁড়িয়েছিল বোবো। সারাদিন সেমিনারের পর এই ডিনারের হইচই আর ভাল লাগছিল না ওর। বোবো যে সুন্দরী, সেটা ও জানে। ওই ডিনারেও, নানা বয়সি পুরুষরা এসে একটু বেশিই ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল। কিন্তু বোবোর একটা লোহার মুখোশ আছে। দরকারে সেটা পরে নেয় ও। সেদিনও পরে নিয়েছিল। আর ঠিক এই একা থাকার ফাঁকটা দিয়েই ঢুকে পড়েছিল ইক্কি...

"আরে, তুমি চুপ করে আছ কেন?" ইক্কি যে ফোনের ওপারে লাফাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে বোবো।

বোবো বলল, "কাম ডাউন, আমি দেখছি কী করা যায়!"

"দেখছি মানে? এখনই এসো ফ্যাক্টরিতে। সর্ট দিস আউট। তারপর আমি যাব।"

"না," গলাটা এবার শক্ত করল বোবো, "আমি আমার সময়মতো যাব। অ্যান্ড ডোন্ট শাউট।"

"কেন? এখন আসবে না কেন তুমি? এখন এলে কী হবে?"

"আমি এখন কলেজ স্ট্রিট যাব। বই কিনব। ডু ইউ নো হোয়াট বুক ইজ!" বোবোর ধৈর্যর বাঁধটা ভাঙল এবার।

"হোয়াট দ্য ফাক ইজ দিস!" ইক্কি চিৎকারটা বাড়াল, "তোমরা বাঙালিরা এত ইন্টেলেকচুয়ালগিরি দেখাও কেন বলো তো? না হয় তোমাদের একজন পোয়েট নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, তাই বলে গোটা জাতটা মিলে তা নিয়ে ভ্যানতারা করবে!"

বোবো জানে আর কথা বাড়ানো বৃথা। ও বলল, "রাখছি আমি।"

"ও, এখন তো রাখবেই, তোমার সেই লাভার মালটার প্রভাব এখনও যায়নি, না? সেই শালা পেটি মিড্ল ক্লাসটা? ওকে তো তোমার মা লাথ মেরে ভাগিয়েছিল তোমার জীবন থেকে, কিন্তু শালার ওই বই পড়ার ব্যাপারটা দেখছি তোমার ভিতর ভাল রকম ট্রান্সফার করে দিয়েছে। একটা সত্যি কথা বলবে?" ইক্কির

গলাটা অন্যরকম লাগল।

বোবো বলল, "কোন সত্যিটা জানতে চাও তুমি?"

"সেই মালটার সঙ্গে তোমার কি এখনও লুকিয়ে যোগাযোগ আছে?"

বোবো কিছু না বলে ফোনটা কট করে কেটে দিল। তারপর সুইচড অফ করে ছুড়ে রাখল পাশের সিটে। মাথাটা হঠাৎ ঝাঁ-ঝাঁ করছে ওর। ইক্কি দিন-কে-দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। কী যে ভুল করেছে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে!

আসলে প্রথম-প্রথম তো এমন ছিল না। তাই বুঝতেও পারেনি। তখনকার ইক্কির সঙ্গে এই ইক্কির যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তখন কত মিষ্টি কথা বলত। কত মজা করত। তখনকার ইক্কিকে মনের কথা বন্ধুর মতোই বলত বোবো। নিজের অতীতের কিছু কথা সেসময়ই বলেছিল। কিন্তু সেটা যে ইক্কি এভাবে আজ বলবে, তা ভাবতে পারেনি।

ইক্কির সঙ্গে কথা বলতে, ঘুরতে যেতে ভাল লাগত বোবোর। কিন্তু কোনওদিন তার বেশি কিছু ভাবেনি। ইক্কিও ফরম্যালি প্রপোজ করেনি। কিন্তু হঠাৎই একদিন ইক্কির বাবা আর মা এসে ওর বাবার কাছে দু'জনের বিয়ের কথা পাড়ে। ওরা বাঙালি, ইক্কিরা পঞ্জাবি এসব বাবা ভাবেনি। কারণ ততদিনে বাবার লাংস ক্যানসার ধরা পড়েছে। বাবা জেনে গিয়েছিল যে, বেশিদিন আর বাঁচবে না। তাই বোধহয় তাড়াহুড়ো করে রাজি হয়ে গিয়েছিল এই সম্পর্কে।

বোবো আপত্তি করেছিল। কিন্তু বাবা শোনেনি। আসলে ছোট থেকে বোবোর কথা তো কেউই বিশেষ শুনত না। বরং বাবা বলেছিল, "তুমি তার সঙ্গে ঘুরতে পারছ, আর বিয়ে করতে পারবে না?"

"কিন্তু ওকে তো আমি সেভাবে দেখি না," বোবো বোঝাতে চেয়েছিল।

"কেন দ্যাখ না? আর না দেখলে ওর সঙ্গে ঘোরো কেন? তুমি কী ভেবেছ যে, অনন্তকাল কুমারী হয়ে থাকবে? আমি তো আর বেশিদিন নেই। তারপর কী হবে? কী হবে তোমার? এত বড় ব্যবসা কে দেখবে? সব কি ছারখার হয়ে যাবে? ওদের বিজনেস ফ্যামিলি, আমাদের রাইভাল হলেও ভাল ব্যবসা করে। বিয়ে হলে ব্যবসাটা আরও জোরালো হবে। তুমি বুঝতে পারছ না যে, এটা মোর দ্যান ম্যারেজ? বুঝতে পারছ না যে, এটা কী ধরনের মার্জার। বলো, কী বলব ওদের আমি?"

বোবো বুঝেছিল যে, বাবা এখন সব যুক্তি-তর্কের বাইরে চলে গিয়েছে। ও কিছু না বলে তাকিয়েছিল বাবার দিকে।

বাবা চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দাও।"

বাবা আজ নেই, তাই দেখে যেতেও পারল না যে, তার সম্মতি দিয়ে যাওয়া বিয়েটা এখনও না করে ইক্কিকে ঠেকিয়ে রেখেছে বোবো। কারণ কিছুতেই মন থেকে সায় পাচ্ছে না ও। কিছুতেই নিজেকে ইক্কির সঙ্গে দেখতে পারছে না। চেষ্টা করেনি, এমনটাও নয়। চোখ বন্ধ করে ও নিজের পাশে ইক্কিকে দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই চোখের পাতা ছিঁড়ে বের হয়ে আসে সেই মুখটা। দীর্ঘ আটবছর পর, আজও সেই মুখটা। বোবো দেখতে পায়, মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে একজন। লাল-হলুদ ফুল ছড়ানো ফুটপাথ দিয়ে চলে যাচ্ছে একজন। পরনে গোলাপি শার্ট, কাঁধে নীল সাইড ব্যাগ।

গাড়িটা এখন বউবাজার পেরোচ্ছে। ড্রাইভার গণেশকে বোবো বলেছে যে, সূর্য সেন স্ট্রিট দিয়ে গিয়ে তারপর বাঁদিকে টার্ন নিয়ে গাড়িটাকে পার্ক করতে। কলেজ জীবনে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের যেখান থেকে বই কিনত সেখানে হেঁটেই যাবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনটাকে শান্ত করল বোবো। ইক্কির কথায় রাগ করে লাভ নেই। যেদিন থেকে বাবা বিয়েতে মত দিয়েছিল, ইক্কিও কেমন যেন পালটে গিয়েছে। এই কয়েকটা বছরে পালটে যাওয়া ইক্কিকে সহ্য করার চেষ্টা করছে বোবো। কিন্তু আর পারছে না। তবে এসব ভেবে লাভ নেই এখন। তাই ও রাস্তা দিয়ে মানুষ দেখায় মন দিতে চেষ্টা করল।

কড়কড় করে মোবাইল বাজল আবার। কী হল, ওর তো তিনটে ফোনই সুইচড অফ, তবে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বোবো বুঝল ব্যাপারটা। গণেশের ফোন বাজছে। বিরক্ত লাগল বোবোর। অনেকবার ও গণেশকে বলেছে যে, গাড়ি চালানোর সময় ফোনটা সাইলেন্ট করে রাখতে। ছেলেটা কোনও কথা যদি শোনে!

"হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ আছেন। দিচ্ছি।"

বোবো পিছনের সিট থেকে গণেশের কথাগুলো শুনল। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। কী হল ব্যাপারটা? গণেশ এমন করে কার সঙ্গে কথা বলছে? ও রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে গণেশের দিকে তাকাল। দেখল গণেশও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে?" বোবো জিজ্ঞেস করল।

"নাঙু। কথা বলতে চাইছেন।"

"নাঙু!" বোবোর অবাক লাগল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও ফোনটা।"

গণেশ রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েও পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বোবো ফোনটা নিয়ে কানে দিল, "নাঙু, তুমি?"

নাঙু হাসল, "তোর কী হয়েছে? সব ক'টা ফোন বন্ধ করে রেখেছিস! তাই তো গণেশের মোবাইলে ফোন করতে হল।"

"কী হয়েছে?"

নাঙু বলল, "ছোট্ট একটা প্রবলেম হয়েছে। ডোঙারিয়ার ওই চক্রবর্তী লোকটি হঠাৎ বেঁকে বসে বলছে যে, ও জমি বিক্রি করবে না।"

"মানে? করবে না মানে?" বোবো সোজা হয়ে বসল।

"শোন, এক্সাইটেড হোস না। আমি দু'জনকে পাঠিয়েছি ওঁর কাছে। আমি তোকে ফোন করেছি অন্য কারণে।"

HOTEL PUNYALAKSHMI
Diamond Harbour
Only Luxury Resort to Ganges

Special Packages for live Durga Puja & Christmas-2012 Punyalakshmi
Regular Packages for Week-end/ Holidays & Week days.
Attraction for day outing:
Phone : +91 3174 255190
Mobile : +91 9679205110
E-Mail : punyalakshmi_hotel@yahoo.in
Visit : www.hotelpunyalakshmi.com
HAPPINESS ON RIVER BANK

Hotel Punyalakshmi

Booking Office
109 / 15, Hazra Road, Kol-26
Contact : +91 9231663678
+91 9239419943

Booking & Marketing Office
21A Rani Sankari Lane,
Ground Floor, Kolkata-26

Mobile : +91 9831705970
+91 9433011656

"কী কারণে?" বোবো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল।

"লোকটার শালার ছেলে নাকি এসে তোর সঙ্গে আজ বজবজ সাইটে কথা বলবে। নাম জীবন-সংগ্রাম। তুই ওর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করবি না। আমি না যাওয়া অবধি ওর সঙ্গে একদম কথাই বলবি না। কেমন?"

"কেন? কথা বলব না কেন?"

নাণ্ডু সিরিয়াস গলায় বলল, "বজবজের বালুরঘাট জায়গাটা ভাল নয়। শুনেছি ওই অঞ্চলে ছেলেটির ঘোরাফেরা খুব। তোকে যা বলছি শোন, ছেলেটা ডেঞ্জারাস। তুই কিছুতেই কথা বলবি না। বুঝেছিস? জমির পিছনে লোক লেগেছে!"

নাণ্ডু এমন করে কথাটা বলল যে, বোবো কিছু উত্তর দিতে পারল না। একটা অস্বস্তি হঠাৎ করে চেপে বসল মনে। এই তো জমিটা নিয়ে কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছিল। এর মধ্যে আবার কী গন্ডগোল হল! জমিটা কি তবে পাওয়া যাবে না? আর লোক লেগেছে মানে? জমির পিছনে কে লেগেছে? কেন লেগেছে? তাকে কি চেনে বোবো?

৩

লোকটার পরনে একটা হাফশার্ট আর থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট। গালে উসকোখুসকো দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। দু' পায়ে দু' রঙের দু'টো হাওয়াই চপ্পল। যবে থেকে এই বিল্ডিং প্রজেক্ট শুরু হয়েছে তবে থেকেই লোকটাকে দেখছে বোবো। গাড়ি করে সাইটে ঢোকার আর বেরোবার সময় দেখা যায়। প্রজেক্ট গেটের উলটোদিকের ফুটপাথে বসে থাকে লোকটা। তবে কখনও-কখনও পিছনের গেটের কাছেও থাকে। সেটা অবশ্য অফিসরুম থেকে দেখা যায় না। বোবো লক্ষ করেছে, লোকটা মাঝে-মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে একা-একা বক্তৃতার ঢঙে হাত-পা নেড়ে কীসব যেন বলে!

গাড়ির ভিতরে বসে বা বিল্ডিংয়ের ভিতরের তিনতলার উপরে ওর অস্থায়ী অফিসে বসে লোকটাকে লক্ষ করে বোবো। ওই বক্তৃতা করা ছাড়াও লোকটা একা-একা হাসে কখনও। কখনও গম্ভীর হয়ে থাকে। আবার কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে কীসব আঁকিবুঁকি করে। খুব কৌতূহল হয় বোবোর। ছোট থেকেই রাস্তার ভবঘুরে, পাগল বা এমন ছন্নছাড়া মানুষদের প্রতি কেমন যেন একটা টান অনুভব করে ও! মনে হয় ওদের পাশে গিয়ে বসে, ওদের গল্পটা একটু শোনে। জানে, কেন ওরা এমন একা-একা থাকে। কিন্তু কোনওদিনই তা সম্ভব হয়নি।

তবে আজকাল কী যেন একটা হচ্ছে মনের ভিতরে। টুনটুনিটা সব কেমন ওলটপালট আর অর্থহীন করে দিয়েছে। এত বড় ব্যবসা, এত বিপুল সম্পত্তি, এত বৈভব সব কেমন যেন বেকার, ফালতু লাগছে! কেমন ফাঁকা লাগছে সবসময়। বুকের ভিতরে যেন হু-হু করে একটা আকাশ ঢুকে পড়েছে। কেন এমন হচ্ছে! কীসের থেকে হচ্ছে এমন? ঠিক বুঝতে পারে না বোবো। আর সত্যি বলতে কী, বুঝতে যেন ভয়ও লাগে। কেবলই মনে হয় মায়ের কথা শুনে যা করেছিল, সেটাকে যদি এখন ভুল লাগে! যদি মনে হয় অন্যায় করেছিল ও! সেই মনখারাপ-চোখের ছেলেটার প্রতি অন্যায় করেছিল! তবে!

চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল বোবো। দুপুরটা একটু ঝিম মেরে আছে। এখন উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আজ মনটা খারাপের সঙ্গে একটু টোলও খেয়ে আছে। আজকাল ইক্কির সঙ্গে কথা বলাই যেন মুশকিল হয়ে গিয়েছে। সবসময় ছেলেটা কেমন যেন ভায়োলেন্ট মুডে থাকে। কোনও কথাই শান্ত হয়ে বলতে পারে না।

আজ সকাল আটটার সময়ে বাড়িতে এসেছিল ইক্কি। আর একদম সোজা এসে ঢুকেছিল শোয়ার ঘরে। স্বভাবতই রাগ হয়ে গিয়েছিল বোবোর। বলেছিল, "কী ব্যাপার তোমার? এমন করে নক না করে ঢুকে পড়লে যে!"

"তু মুঝে পাগল কর দেগি," ইক্কি হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে উঠেছিল, "শার্টগুলো নিয়ে কোনও অ্যাকশন নেওয়া হয়নি কেন?"

"প্রয়োজন পড়েনি তাই নিইনি," স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল বোবো।

রাগ হচ্ছিল বোবোর, খুব রাগ হচ্ছিল। সেদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে আর সাইটে যায়নি ও। সোজা অফিসে চলে গিয়েছিল। নাণ্ডুর সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল খুব। সেখানেই ও নাণ্ডুকে জিজ্ঞেস করেছিল ইক্কিদের শার্টের ব্যাপারটা। সব শুনে নাণ্ডু হেসেছিল, বলেছিল, "ও এসব বলছে! ইক্কি খুব বোকা নয়তো ওর বাবার হাতের পুতুল।"

"মানে?" বোবো বুঝতে পারছিল না নাণ্ডু কী বলতে চাইছে।

নাণ্ডু হেসে বলেছিল, "ইক্কি গল্প দিচ্ছে। ওসব এলডি ক্লজ-ফ্লজ সব ফালতু। আমরা যে আর্জেন্তিনার থেকে প্রচুর গারমেন্টসের অর্ডার পেয়েছি, সেটা ওরা জানে। তাই ওদের গাত্রদাহ হচ্ছে। ওই পঞ্চাশ হাজার শার্ট আমাদের দিয়ে করাতে চাওয়ার পিছনে আমাদের প্রোডাকশন ডিলে করিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত আছে। ওদের ফ্যাক্টরিতে সামান্য রিপেয়ারিং জব ছিল। আর ওরা দেড়লাখ নয়, সাড়ে তিনলাখ শার্টের অর্ডার পেয়েছে। বুঝলি কিছু? ইক্কিটা গবেট হতে পারে, ওর ওই বাপটা নয়। আমাদের কোম্পানিকে কীভাবে কোথায় মারা যায়, তার নিখুঁত ছক আছে লোকটার মাথায়। পঞ্চাশ হাজার শার্ট কী এমন বল? কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের প্রোডাকশনটা সামান্য হলেও তো পিছিয়ে যাবে। আমাদের নিজের মাল সাপ্লাই করতে দেরি হবে। আর তার সূত্র ধরে গোটা গারমেন্টস মার্কেটে আমাদের রেপুটেশনের বারোটা বাজবে, আর সেই সুযোগে লাতিন আমেরিকান মার্কেটের বড় একটা শেয়ারে ওরা মাথা গলিয়ে দেবে। আমাদের রাধিকা গ্রুপের পিছনে ওরা কবে থেকে লেগেছে জানিস না!"

"তুমি এত সব জানলে কী করে? কর্পোরেট এসপিয়োনেজ শুরু করেছ নাকি?" বোবো হেসেছিল।

নাণ্ডু বলেছিল, "তেমনভাবে না, তবে ওদের কোম্পানির সকলেই

একটি আশ্চর্য ঝলক
কিন্তু ১০০% সত্যি
সিদ্ধ চমৎকারী আংটি
এই চমৎকারী সিদ্ধ আংটি পরলে বা কাছে রাখলে যে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীর নাম নিলেই সেই পুরুষ বা স্ত্রী যে কোনও মনভাবেরই হোক না কেন আপনার দ্বারা বশীভূত হবে। ব্যবসায় লাভ, পরীক্ষায় সফলতা, মামলা-মকদ্দমায় জয়লাভ, মনেরমতো বিয়ে, উচ্চ চাকরী, সন্তান প্রাপ্তি ও সমস্ত গ্রহের কুপ্রভাব থেকে নিশ্চিত মুক্তি পাবেন। সর্বদা আনন্দ বিরাজমান থাকবে। যে কোনও কাজে আপনি সফলতা পাবেন।
সিদ্ধ চমৎকারী আংটির জন্য স্বামীজির সাথে যোগাযোগ করুন।
07739849940 / 08579960788

ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়? নিরাশ কেন?
জাপানি পট্টিনুমা
ইন্দ্রিয় বর্ধক যন্ত্র ফ্রী!!!
আয়ুর্বেদের নতুন চমৎকার
উৎসাহ বাড়বে, চরমক্ষমতা জাগবে
এই যন্ত্র ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতা, পাতলাভাব, ব্যাঁকাভাব, দূর করে ইন্দ্রিয়কে ৭ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা, মোটা ও সুদৃঢ় করে। পুরুষত্বহীনতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ, সন্তানহীনতাকে দূর করে সেক্স টাইম ৩০-৪৫ মিনিট পর্যন্ত বাড়ায়। ৪৫ দিনের ওষুধের সঙ্গে জাপানি পট্টিনুমা ইন্দ্রিয় বর্ধক যন্ত্র, মন্ত্রী তেল, উত্তেজনা ক্যাপসুল, রোমান্টিক স্প্রে, কামসূত্র পুস্তিকা, ডিভিডি, ৮ জিবি মেমোরি কার্ড, ব্রেস্ট ম্যাসাজ তেল ফ্রি।
09162393556
07631802148
লাভ না হলে মূল্য ফেরত, ভাববেন না ফোন করুন।

সাদা দাগ
হাজারো রোগীর দ্বারা প্রশংসিত
নতুন আবিষ্কৃত এই আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রয়োগের ৫-৬ ঘন্টার মধ্যেই দাগের রং বদলাতে থাকে এবং দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একশ শতাংশ নিশ্চিত। রোগের বিবরণ দিয়ে ৩০ দিনের ফ্রি লাগানোর ঔষধের জন্য বিশেষজ্ঞ কবিরাজকে ফোন করুন। যদি অনত্রও চিকিৎসা করিয়ে থাকেন, তবুও আমাদের এখানকার চিকিৎসার একবার সুযোগ নিন।
09334671760
09631523151

খুব একটা হ্যাপি এমপ্লয়ি নয়। আমি জাস্ট মাঝে-মধ্যে তাদের অ্যাগনি আন্টের কাজ করি। তবে অবশ্যই উইথ দ্য পিলো অফ মানি।"

নাগুর কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল বোবোর, তাই আজ সকালে ইক্কি বেগড়বাই করতেই সেগুলো সিপাহি বিদ্রোহের কারণের মতো গড়গড় করে বলে দিয়েছিল।

উড়ন্ত মথ ফুল স্পিডে ঘোরা ফ্যানের ব্লেডে লেগে যেমন থপ করে মেঝেতে পড়ে ঠিক তেমনভাবে চেয়ারে বসে পড়েছিল ইক্কি।

বোবো বলেছিল, "শেম অন ইউ। আমায় তুমি মিথ্যে বলে আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলে?"

ইক্কি প্রথমে কথা বলতে পারেনি কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা চেয়ার থেকে উঠে এসে বোবোর হাত দু'টো ধরে বলেছিল, "আর কতদিন ওয়েট করাবে আমায় তুমি? চলো, আমরা এবার বিয়েটা করে নিই।"

"মানে?" হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল বোবো। বলেছিল, "ডোন্ট ইউ ডেয়ার টু চেঞ্জ দ্য টপিক। কেন করলে তোমরা এমন?"

ইক্কি একগুঁয়ে বাচ্চার মতো বলেছিল, "কেন আমায় বিয়ে করছ না তুমি? আমরা এক হব। উই উইল মেক কিডস। আমাদের বিজনেস একসঙ্গে করব। উই উইল লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার। কেন ফেয়ারি টেল লাইফটাকে অবহেলা করছ?"

"না, তোমায় এখন বিয়ে করব না। সরে যাও তুমি। সরে যাও," বোবো ইক্কিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে গিয়েছিল।

ইক্কি ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "আই কান্ট বিলিভ দিস। তুমি এমন করবে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমি কোনওদিন এই তুমিটাকে দেখিইনি!"

বোবো ধীর কিন্তু পাথুরে গলায় বলেছিল, "তোমার দেখার বা তোমার বিশ্বাসের বাইরেও পৃথিবী আছে। নিজেকে অমন সবজান্তা ভাবার কিছু হয়নি। তোমার এক্সপিরিয়েন্স নেই বলে কি তা পৃথিবীতে থাকতে পারে না! এমন মূর্খের মতো ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসো। মনটাকে বড় করো। জানবে এনিথিং, সিম্পলি এনিথিং ইজ পসিবল ইন লাইফ।"

"বুড়ি হয়ে ঘরে বসে থাকো। ডোন্ট ফরগেট ইউ আর টোয়েন্টি নাইন প্লাস। দেখব কে তোমায় বিয়ে করে!" চেঁচিয়ে প্রায় দৈববাণীর মতো করে কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ইক্কি।

বুড়ি? ও কি বুড়ি হয়ে যাচ্ছে? জানালার কাচে নিজের আবছা ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল বোবো। উনত্রিশ বছর হয়ে গেল! এই তো সেদিন ওয়াটার বটল গলায় ঝুলিয়ে ও স্কুলে যেত। ছোট্ট হাত দিয়ে ধরে থাকত মায়ের আঙুলগুলো। এই তো সেদিন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত ও। লেকের ধারে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিত। একজন বলত, "বুড়ি হয়ে গেলেও তোর মতো সুন্দরী পৃথিবীতে আর-কেউ হবে না!"

এখন কোথায় সে? সেই যে লাল-হলুদ ফুটপাত পেরিয়ে মাথা নিচু করে চলে গিয়েছিল, তারপর সে কোথায় মিশে গেল? কোন ভিড়ে হারিয়ে গেল সে? না হয় মায়ের কথা শুনে ওকে বারণ করে দিয়েছিল ওর সামনে আসতে, তাই বলে মনে-মনে কি আর বারণ করেছিল? মনের কথা বুঝতে পারেনি একটুও? কেন পারেনি? মুখে বলাটাই কি সব? মনে-মনে যে এতবার করে বলল, "আমায় ছেড়ে যাস না", সে শুনল একবারও? একবারও পিছনে ফিরে দেখল? এই আটবছর সে একবারের জন্যও খোঁজ নিয়েছে, বোবো বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে? সে তো বলত ভালবাসে। পাগলামি করত। বোবোর টিউশন শেষ না হওয়া অবধি বড় রাধাচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকত। সে তো রাস্তায় বসে বোবোর পা কোলে নিয়ে পায়ে ব্যান্ড-এড পর্যন্ত লাগিয়ে দিয়েছিল। পাত্তাই দেয়নি কে কী ভাববে সেসব। তা হলে? তা হলে সে শুধু মুখের কথাটুকুই ধরবে? মনের কোনও কথা থাকতে পারে না? সে কেন অমন বোবোকে একা করে দিয়ে সকলের সামনে থেকে মাথা নিচু করে চলে গিয়েছিল? চলে যাওয়ার সময় একবারও কেন ওপারের ফুটপাথ থেকে দ্যাখেনি নিজের ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকা বোবোকে?

"ম্যাডাম আসব?" সাইট ইনচার্জ বিকাশের গলা।

বোবো জানালার দিক থেকে পিছন ফেরার আগে এক মুহূর্ত সময় নিল। আলতো হাতে চোখের দু'টো কোণ টিপে জলের আভাটা মুছে ফেলল। তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

বিকাশ ঘরে ঢুকে বলল, "ম্যাডাম, 'চক্রবর্তী সাপ্লায়ার্স' নামে একটা পার্টি বেশ কিছুদিন ধরে ঘুরছে। বলছে সাপ্লাই দেবে মিসেলেনিয়াস জিনিসপত্র, তাই..."

বোবো ভুরু কুঁচকে কড়া গলায় বলল, "আঃ, এসব ব্যাপার নিয়ে তুমি আমায় বলছ কেন? তুমি সাইট ইনচার্জ, হ্যান্ডল ইয়োরসেলফ। তা ছাড়া তেমন হলে হেড অফিসের পারচেজের লোকজন আসে, তাদের বলো। আমায় এখন এসব দেখতে হবে?"

"সরি ম্যাডাম," বিকাশ থতমত খেল।

"আর কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ, দু'জন দেখা করতে এসেছে," বিকাশ সাবধানী গলায় বলল।

"কারা? অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসেছে কি?"

"না ম্যাডাম, তবে," বিকাশ ইতস্তত করল।

"তবে কী?" বোবো চেয়ারে বসল এবার।

"আমরা ম্যাডাম এখানে থাকি। অনেক রাত অবধি কাজ হয়। এরা লোকাল লোক। যদি একবার দেখা করে... ইয়ে..."

"কাজ করতে কি তোমাদের ইনসিকিওর লাগে? আমায় বলো। আমি ব্যবস্থা করে দেব। এই অঞ্চলের পলিটিক্যাল পার্টির মাথাদের নিয়মিত চাঁদা দিই। তারাও খুব কর্ডিয়াল। আর প্রশাসনের সঙ্গেও তো আমার যোগাযোগ আছে। ওদের বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর

virtual frame

দি কেশব জুয়েলার্স

হলমার্কড গহনা ॥ ডায়মন্ড জুয়েলারী ॥ গ্রহরত্ন

॥ পূজোর টানে পূজোর গানে
মন ছুঁতে চায় আনমনে ॥

হলমার্কড গহনা ॥ ডায়মন্ড জুয়েলারী ॥ গ্রহরত্ন

হাবরা, ২৪ পরগণা (উঃ) ফোন : ০৩২১৬ ২৩৩২৯৯, ৯৭৩৫৭৪৭৭০২

কিছু?" বোবো বিকাশের দিকে তাকাল।

"তাও ম্যাডাম যদি প্লিজ..."

বোবো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "সত্যি! ঠিক আছে, কিছু তো তেমন করছি না। পাঠিয়ে দাও।"

বিকাশ গিয়ে যাদের নিয়ে এল তাদের দেখেই নিজের অজান্তে ভুরু কুঁচকে গেল বোবোর। দু'জন লোক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড দুজনকে দেখতে একদম একরকম। এমন আইডেন্টিকাল টুইন জীবনে দ্যাখেনি বোবো। তবে একজন হলুদ জামা পরে রয়েছে আর অন্যজন কালো। কালো জামা পরা লোকটার চোখমুখে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেলা করছে। লোকটার চোখ সরাসরি বোবোর বুকের দিকে তাক করে রয়েছে।

বোবো শক্ত গলায় বলল, "কী চাই আপনাদের? আপনারা কে?"

হলুদ শার্ট বলল, "ডোঙারিয়ার নারায়ণ চক্কোত্তিকে চেনেন? আমরা তার শালার ছেলে। জীবন আর সংগ্রাম।"

"কী? জীবনসংগ্রাম? এখানে কার জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে এসেছেন?"

হলুদ শার্ট একটু থতমত খেল, তবু দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, "ওটা আমাদের নাম। আমি জীবন আর ও সংগ্রাম।"

বোবো ওদের বসতে বলল না। দেখলেই বোঝা যায় ছ্যাঁচড়া লোক। কিছু বিশেষ করে না। এরটা মেরে, ওরটা কেড়ে খায়। ফালতু পার্টি। দু'-একটা কথা বলে কাটিয়ে দিলেই হবে।

"তো, কী চান?"

"দেখুন দিদিমনি, আমাদের হিসেব সোজা। আমাদের পিসেমশাই একটু ছিটেল মানুষ। ওসব জমি যে-দামে আপনাকে দিচ্ছেন, সেটা উনি ভুল করে বলেছেন। ওই পঁচিশ লাখে হবে না। কমসে কম চল্লিশ লাখ লাগবে। এটা আমাদের নতুন পেরাইস!" জীবন মুখ বেঁকিয়ে বলল।

"জমিটা কি আপনাদের নামে?" বোবো শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"না, মানে আমাদের পিসেমশাইয়ের নামে।"

"তবে আপনারা এই নিয়ে কথা বলছেন কেন? আপনাদের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আছে? অথরিটি আছে এই নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার? আপনাকে আপনার পিসেমশাই নমিনেট করেছেন এই নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য?"

"অ্যাঁ?" জীবন একটু টসকাল। চট করে সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে নিল একবার।

"এসব নিয়ে কথা বলতে এসেছেন আর নিয়ম জানেন না? শুনুন আমি দেড় দু' কাঠা জমি কিনতে আসিনি। একটা একতলা বাড়ি করে, দু'বছর পর প্লাস্টার করে, তিনবছর পর রং করে আমি সেখানে থাকব, এমন ভাবার কারণ নেই। আমি একটা গ্রুপ অব কম্পানিজ চালাই। তাই আমায় এসব ভড়কি দিয়ে লাভ হবে না। আপনার পিসেমশাইয়ের কিছু বলার থাকলে তাঁকে কিছু বলতে বলুন, না হলে আপনারা অথরিটি নিয়ে আসুন তখন কথা বলা যাবে। বুঝেছেন?"

"এটা কিন্তু ঠিক হল না!" এবার সংগ্রাম বলল।

"ঠিক কী ভুল, সেটা আমি বুঝব। এখন যান," শেষের কথাটা ধমকের সুরে বলল বোবো।

লোকদুটো চোয়াল শক্ত করে তাকাল বোবোর দিকে, তারপর কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

বোবো বিরক্তিতে মাথা নাড়াল। সত্যি, বিকাশ কাকে-কাকে যে নিয়ে আসে! ওকে এবার একদিন ভাল করে ঝাড়তে হবে। জলের গেলাসটা তুলে জল খেল একটু ও। তারপর একটা ফাইল তুলে এক্সপেনডিচার রিপোর্টে চোখ বোলাল। না, মন বসছে না কিছুতেই। একবার নীচে যাবে। এই ভেবে বোবো ফাইলটা রেখে উঠতে যাবে এমন সময় হুড়মুড় করে বিকাশ এসে আবার ঢুকল ঘরে। বিকাশ পারমিশন না নিয়ে এমনভাবে ঢুকল যে, বোবো বুঝল কিছু হয়েছে একটা। ও সটান দাঁড়িয়ে পড়ল, "কী হয়েছে? এমন করছ কেন?"

বিকাশ কোনওমতে বলল, "নাঙু, মানে ওঁর অ্যাক্সিডেন্ট, মানে, নীচে।"

নাঙুর অ্যাক্সিডেন্ট! বোবো টলে গেল একটু। নাঙুর কখন অ্যাক্সিডেন্ট হল? কী করে হল? ঠিক আছে তো মানুষটা?

বিকাশ বলল, "তাড়াতাড়ি চলুন ম্যাডাম, সিরিয়াস অবস্থা।"

বোবো দাঁড়াল না। নাঙুর কিছু হওয়া মানে বোবোর পৃথিবী নড়ে যাওয়া। ও দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

৪

রবিবারের সন্ধেবেলা খুব শান্ত আর নির্জন হয়। আলিপুরে ওদের এই উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাংলোটা এমনিতেই চুপচাপ, শান্ত। কিন্তু রবিবারের সন্ধেটায় এই বাংলো যেন একটা অন্য নিস্তব্ধতায় পৌঁছে যায়।

বোবোর বন্ধুবান্ধব নেই কোনও। কলেজে কয়েকজন বন্ধুর মতো হয়েছিল, কিন্তু তেমন ঘন বন্ধুত্ব হয়নি কারও সঙ্গে। আসলে কলেজের বেশির ভাগটাই তো দখল করে নিয়েছিল সে। তারপর কলেজ শেষ হল। সে শেষ হল। বোবোকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডন। সেখান থেকে দু'বছর পর ফিরে জয়েন করল বিজনেসে। ফলে এটা-ওটার মধ্যে আর যাই হোক না কেন, বন্ধু জিনিসটা সেভাবে আর হলই না। এখন অফিসের বাইরের যেটুকু সময় বোবো পায় তা একাই কাটায়।

মাঝে-মধ্যে রবিবারগুলোয় ইক্কি অবশ্য আসে। কখনও এখানেই বসে কথা বলে আবার কখনও ওর বিশাল গাড়িটায় বোবোকে নিয়ে এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়ে। গতদিনের ঝগড়ার পর এই রবিবার ইক্কি ফোনও করেনি আর আসেওনি।

একদিক দিয়ে বেঁচে গিয়েছে বোবো। ইক্কিকে ওর মোটেই ভাল লাগে না আজকাল। মানে প্রেম তো কোনওদিনই ছিল না, বরং একটা

ভাললাগা ছিল, সেটাও উবে গিয়েছে। বাবার জোরাজুরিতে ওকে বিয়ে করতে রাজি হওয়াটা খুব বোকামো হয়েছে বোবোর। তাই তো এখন নানা বাহানায় কাটিয়ে দিচ্ছে ইক্কিকে। আর বোবো এটাও বুঝতে পারছে, ইক্কির ইন্টারেস্টটা আসলে ওর উপর নয়, ওর বিজনেসের উপর।

দিদি এসেছে। কিন্তু এখানে আসেনি এখনও। নীচে এসে কীসব রেখে নাঙুকে দেখতে গিয়েছে। নিনিই খবর দিয়েছে ওকে।

সেদিন নাঙুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল বোবো। এই লোকটাই তো ওর জীবনের স্তম্ভ। তার অ্যাক্সিডেন্ট? বড় কিছু হয়নি তো? হলে ওর কী হবে?

প্রাথমিকভাবে এই কথাগুলো মাথায় এলেও তার পরই নিজের উপর কেমন যেন একটা বিরক্তি আর রাগ এসেছিল। ও শুধু নিজের জন্যই ভাবছে! নাঙুর কিছু হয়েছে কি না তার চেয়ে ওর নিজের সিকিওরিটি কি বেশি? লোকটার তো ও ছাড়া আর-কেউ নেই। ওর, ওদের পরিবারের, ওদের ব্যবসার জন্য তো সারাটা জীবন বিয়ে পর্যন্ত করল না। নিজের জন্য চিন্তা পর্যন্ত করল না। ঋষিদের মতো কাটিয়ে দিল জীবনটা। আর তার যখন কিছু হল, তখন নিজের জন্য চিন্তাটা স্বার্থপরতা হয়ে যাচ্ছে না?

নিজের রুম থেকে দৌড়ে নীচে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল বোবো। একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল নাঙু। পরনের সাদা পাঞ্জাবিতে লাল রক্তের ছিটে। আর মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাথাটা ফেটেছে। নাঙুকে ক্লান্ত লাগছিল বেশ।

দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল বোবো, "কী হয়েছে নাঙু? কী করে হল এটা? আমায় একটা ফোন করোনি কেন?"

নাঙু হাত তুলে হেসেছিল, বলেছিল, "দাঁড়া দাঁড়া, এমন করিস না। এত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি? জানিস না আমি বরাবর ওরালে কাঁচা!"

"দিস ইজ নট ফানি। তুমি ইয়ার্কি মারছ? কোথায় হল এটা? কী করে হল?"

নাঙু সামান্য সময় চোখ বন্ধ করে হেসেছিল একটু। দুর্বল হাসি। সাতষট্টি বছরের শরীরটার উপর দিয়ে যে বেশ কিছুটা ঝড় বয়ে গিয়েছে, দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল।

নাঙু ধীরে-ধীরে বলেছিল, "ওই কুইন সিনেমার কাছে একবার গাড়ি থেকে নেমেছিলাম আমি মিনারেল ওয়াটার কিনব বলে। ড্রাইভার ছেলেটা বলল ও কিনে আনবে, কিন্তু এতটা আসতে-আসতে পা ধরে গিয়েছিল বলে আমিই নেমেছিলাম লেগ স্ট্রেচ করব বলে। রাস্তার উলটোদিকে একটা পানের দোকান ছিল। রাস্তাটা ক্রস করতে যাব এমন সময় ম্যাটাডোরের মতো একটা গাড়ি এসে প্রায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর কী! আমি পিছতে গিয়ে একটা সাইকেলের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলাম রাস্তার পাশে পাথরের উপরে। তারপর জ্ঞান ছিল না আমার। পরে জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফেরে। একটা ছেলে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই আমায় কাছের একটা পলি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। মাথায় চারটে স্টিচ হয়েছে। ওই ছিল সঙ্গে সবসময়। আমি রক্ত দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কথা বলতে পারছিলাম না। ছেলেটাই কথাবার্তা বলে ওষুধ-টসুধ কিনে দিয়ে আমায় গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর আমি এমন বোকা যে, সবকিছুর ভিতরে ওর নামটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি।"

"তা হতেই পারে," বোবো নাঙুর পাশে একটা চেয়ারে বসে বলেছিল, "এমন শকের পর যে-কোনও লোকেরই এটা হতে পারে। তা আমায় একটা ফোন করতে পারোনি?"

"আরে ফোনটা তো ভেঙে গিয়েছে মাটিতে পড়ে আর ড্রাইভার ব্যাটাও ওর ফোন আনেনি। ছেলেটা জানতে চাইছিল আমি কোথায় আসছি, ও পৌঁছে দেবে কি না। কিন্তু আমি না করেছি। আর বলিওনি এখানে আসব। শুধু বলেছি, কাছেই যাব। ওকে আর কষ্ট করতে হবে না। ছেলেটাও আর বেশি ঘাঁটায়নি। চলে গিয়েছিল।

"ছেলেটিকে ভাল বলতে হবে," বোবো বলেছিল, "আজকাল কে কার জন্য এমন করে! থ্যাঙ্কস দিলে হত। কিন্তু তার তো আর উপায় নেই! যাক, তুমি আর কথা বলো না। এখানে একটু শুয়ে থাক, তারপর আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে।"

নাঙু কিছু হয়নি বলে কাজ করতেই চেয়েছিল। কিন্তু সেদিন নাঙুর কথা পাত্তাই দেয়নি বোবো। সটান বাচ্চাদের মতো বকে রেস্টরুমে পেতে রাখা খাটে শুয়ে থাকতে বলেছিল।

তারপর চারদিন নাঙু অফিসে যায়নি। স্টিচগুলো সেলফ ডিসলভ্ড ধরনের। কাল থেকে নাঙু অফিস যাবে বলে ঠিক করেছে কিন্তু বোবো বলেছে, আরও দু'টো দিন রেস্ট নিতে।

দুপুরবেলা নাঙুকে একবার দেখে এসেছে বোবো। আবার রাতে একবার যাবে। ভেবেছিল সন্ধেবেলা যাবে, কিন্তু দিদি এসে ওখানে গিয়েছে শোনার পরে আর যাবে না। কারণ দিদি নাঙুর সামনে ওকে পেলে ছুতোয়-নাতায় একটা না একটা ঝগড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে তুলবেই। আজ সেটা চায় না বোবো। তাই ঘরেই বসে আছে।

দিদি ছোট থেকেই এমন। বোবোর ব্যাপারে সবসময় কেমন যেন লাল পেনসিল নিয়ে বসে থাকে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে ও। সে ওর ক্লাস ওয়ানে করা ড্রইংয়ের খুঁত বের করাই হোক বা এখন এই বয়সে জামা-কাপড় কেনাই হোক। বোবোর কিছুই যেন পছন্দ হয় না দিদির। সবসময় একটা অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে দিদি তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। যেন চোখ দিয়ে বলে, সব ভুল হচ্ছে।

মা বেঁচে থাকতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল দিদির। ওর চেয়ে ন'বছরের বড়। পড়াশোনাতেও খুব কিছু ভাল ছিল না। তবে দিদি দেখতে খুব সুন্দরী আর লোকের সঙ্গে মিশতেও পারে দ্রুত।

একটা জিমে জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দিদির। সেটাই ক্রমশ বিয়েতে গিয়ে ঠেকেছে। জামাইবাবুরাও খুব পয়সাওয়ালা। তাই মা-বাবা আপত্তি করেনি। এখন দিদির ভরা সংসার। এক ছেলে

দেরাদুনে একটা নামকরা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে, আর মেয়ে দিদির কাছেই থাকে। দিদি এখানে সংসার, পার্টি আর একটা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ার পার্সন হয়ে, ব্যস্ত থাকে খুব। ওদের বাড়িতে খুব একটা কিছু আসে না। ব্যবসা বা সম্পত্তি নিয়ে দিদির কোনও আগ্রহ নেই। জামাইবাবুর রোজগার বিশাল, তা ছাড়া জামাইবাবু এক ছেলে। ওদের প্রপার্টি কে সামলায় তারই ঠিক নেই।

লম্বা সোফায় শুয়ে একটা হাই তুলল বোবো। আজ সারাদিন রেস্ট নিয়েছে ও। তবু কেন যে এত ক্লান্ত লাগছে ঠিক বুঝতে পারছে না। বোবো উঠে ঘরের বাইরে বেরল।

ঘরের বাইরে লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দায় সার দেওয়া বেলজিয়ান গ্লাসের ল্যাম্প ঝুলছে। বারান্দার আর-এক প্রান্তে নীচে নামার সিঁড়ি। আর তার পাশে নিনির ঘর।

"নিনি এক কাপ কফি হবে প্লিজ..." বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল বোবো।

সামান্য সময় পরে হালকা একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল বোবো। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পেল দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দিদি আর নাঙু! আরে, দিদি নাঙুর সঙ্গে এসে তা হলে এখন নিনির সঙ্গে কথা বলছে।

নিনিও নাঙুর পিছনে মুখ বাড়াল, "কফি? ঠিক আছে, দিচ্ছি আমি।"

দিদি বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, "আমার আর নাঙুর চা-টাও ওর ঘরে দিও। ওর সঙ্গে দরকারি কথা আছে।"

বোবো চোয়াল শক্ত করল। দিদির ওর সঙ্গে কথা আছে! সর্বনাশ! কী কথা? আজ ভাল লাগছে না ঝগড়া করতে। কিন্তু দিদি কি সেটা করবেই?

বোবোর ঘরের একদিকে একটা বড় জানালা আছে। তার সামনেই লেদারের সোফাটা রাখা। দিদি আর নাঙু সেখানেই বসল। দিদি বোবোর দিকে তাকিয়ে বলল, "বোস।"

বোবোর মনে হল ও আবার ছোট হয়ে গিয়েছে, আর নিশ্চয়ই হাত থেকে ফেলে কোনও দামি জিনিস ভেঙেছে। এবার বেদম বকা খাবে।

উলটোদিকে একটা বিন ব্যাগ টেনে নিয়ে বসল বোবো।

"কী করেছিস তুই?" দিদি সটান চোখ রাখল বোবোর চোখে।

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুই। কেন এমন করছিস?"

"কী বিষয়ে বলছিস তুই? বুঝতে পারছি না।"

"ইক্কিকে কী বলেছিস তুই?"

"আমি জাস্ট বুঝতে পারছি না কী হয়েছে?" বোবো ভুরু কুঁচকে তাকাল এবার, "স্পষ্ট করে বল।"

"ন্যাকামো করিস না। তুই আর ছোট নোস। ইক্কিকে বিয়ে করবি না বলেছিস?"

"তুই তো বললি আমি ছোট নই, তা হলে কেন এমন বলছিস? বড় হয়েছি যখন, তখন আমায় ঠিক করতে দে আমি কী করব।"

"বাজে কথা বলিস না," দিদির মুখ লাল হয়ে উঠল, "বড়দের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় সেটাই দেখছি ভুলে গিয়েছিস। নিজে বিজনেস করিস বলে ভাবিস না যে, সাপের পাঁচ পা দেখেছিস?"

"আরে," বোবো উঠে দাঁড়াল, "কী বলছিস তুই?"

"বোস," দিদি গলাটা কঠিন করল আরও, "বোস বলছি।"

বোবো নাঙুর দিকে তাকাল। দেখল নাঙু চোখের ইশারায় ওকে শান্ত হতে বলছে। বলছে বসে পড়তে।

বোবো নিজেকে সংযত করল। জোরে শ্বাস নিল একটা। তারপর বসল আবার। বলল, "বল।"

"আজ ইক্কি এসেছিল আমার কাছে," দিদিও নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল, "ছেলেটা খুব ভেঙে পড়েছে। তুই এমন করছিস কেন? যথেষ্ট তো বয়স হল তোর, এখনও বিয়ে না করলে কবে করবি?"

বোবো শান্ত গলায় বলল, "ইক্কিকে ভাল লাগে না আমার। ও ভাল ছেলে নয়।"

"মানে?" দিদি অবাক হল, "তা হলে এতদিন ওর সঙ্গে ঘুরলি কেন? চারবছর সময়টা কিন্তু অল্প নয়। এখন এসব বললে হয়?"

"আমি এমনি বন্ধু হিসেবে ঘুরেছি। আর বিয়েটা জোর করে ঠিক করা হয়েছিল। আমি তার জন্য দায়ী নই।"

"আমাদের ফ্যামিলির কোনও প্রেস্টিজ নেই?" দিদি রাগ করছে আবার।

"আমার জীবনের থেকে ফ্যামিলি প্রেস্টিজের দাম বেশি? জানিস তুই, গতবছর ইক্কি একবার আমায় মেরেছিল!"

"কী?" এবার নাঙু কথা বলল, "তোকে মেরেছিল? কী বলছিস তুই? আমায় বলিসনি তো?"

"কী হবে বলে? ইক্কি এমনিতেই তো ভায়োলেন্ট। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়েছিল।"

"তা হলেও, গায়ে হাত দেবে?" নাঙু চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রইল।

"আঃ নাঙু," দিদি বিরক্ত হল, "ও তো বলছে মিটে গিয়েছে। আর সেটাকে স্ট্রেচ করে লাভ আছে? ইক্কি ভাল ছেলে। ওরা অবাঙালি হলেও বাড়ির কালচার বাঙালির মতো। ইক্কির মা তো বাঙালি। বোবোর কোনও প্রবলেম হবে না। ও কেন যে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখছে?"

"আমি এখন বিয়ে করব না। ওই বজবজের আর্কটিক ভিলেজের কাজটা শেষ না হলে আমি বিয়ে করব না।" বোবো একজন কাজের লোকের দিয়ে যাওয়া কফির কাপটা তুলল। নিনি জানে দুই বোনে কথা হচ্ছে তাই নিজে না এসে অন্যকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

"এটা কোনও কথা হল?" দিদি ওর চায়ের কাপ ছুঁয়েও দেখল না, "এমন ভাব করছিস যেন পৃথিবীতে কেউ কোনও কাজকম্ম করে না!

শুভ শারদীয়া
শুরু হল এক গভীর, কর্মময় ও স্বনির্ভর পথচলা
SEA STONE
Limited
নিয়ে এল এক গুচ্ছ লাভজনক প্রকল্প
REAL ESTATE | MUSTARED OIL MILL | INDUSTRIAL PLOT | HOTEL | HOUSING COMPLEX
INSURANCE COVERAGE | HOSPITAL | TEA PROJECT | NEEM OIL | B.Ed. COLLEGE
Corporate Office: Makardah, Howrah-Amta Road, Howrah-711 409 (W.B.)
www.seastone.in | E-mail: seastonedevelopers@yahoo.in | Call: 033 26708191

এত স্বার্থপর কেন রে তুই?"

"আমি স্বার্থপর?" বোবোর মাথা গরম হয়ে গেল, "কোন কাজটা আমি নিজের স্বার্থ ভেবে করেছি রে দিদি? বাবা-মা যা বলেছে, তাই করেছি। চিন্তা পর্যন্ত করিনি একবারও। আর আমি স্বার্থপর?"

দিদি চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়াল, "ও বুঝেছি, সেই ছেলেটার ভূত এখনও মাথা থেকে যায়নি তোর!"

বোবো বলল, "মানে?"

দিদি এবার নাঙুর দিকে ঘুরল, "নাঙু তুমি সেই ছেলেটাকে দেখেছিলে?"

নাঙু মাথা নাড়ল, "না, দেখিনি তো। সেসময় একটা বড় কাজের জন্য কয়েকবছর আমি দেশের বাইরে ছিলাম যে।"

"দেখলে বুঝতে," দিদি হিসহিসে গলায় বলল, "একটা পেটি মিডল ক্লাস ছেলে। ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ে। না আছে চাল না আছে চুলো। জামা-কাপড়টা পর্যন্ত ভাল পরত না। কী করত জীবনে ও? ওকে বিয়ে করবি বলেছিলি যে, ও আমাদের যোগ্য? আমিও তোর জামাইবাবুর সঙ্গে ভাব করে বিয়ে করেছি। কিন্তু জামাইবাবুর প্রোফাইল দেখেছিস!"

"ওকে তো বিয়ে করিনি দিদি। বাবা-মা ওকে খুব অপমান করেছিল। আমিও মায়ের কথা শুনে ওকে..." বোবো আর বলতে পারল না। কোথা থেকে একরাশ ঢেউ এসে ডুবিয়ে নিল ওর কথা। মনে হল, গলার ভিতর কে যেন সিমেন্ট ভরে দিয়েছে, বুকের ভিতর চাপিয়ে দিয়েছে পাথর। খুব কষ্ট হচ্ছে বোবোর। জল আসছে চোখে। তবে কাঁদবে না ও। কিছুতেই কাঁদবে না।

দিদি ওর দিকে কেমন অদ্ভুত এক ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল, বলল, "বরাবর তোর নিচুর দিকে দৃষ্টি। এখনও তুই এমন হয়ে আছিস! শেম অন ইউ। বাবা-মা মারা গিয়েছে ভালই হয়েছে। না হলে তোকে দেখে তারা কষ্টেই মারা যেত," আর দাঁড়াল না দিদি। হনহন করে বেরিয়ে গেল। নাঙু ওর দিকে ইশারায় ভরসা দিয়ে দিদিকে ঠান্ডা করতে বেরিয়ে গেল।

আধো অন্ধকার ঘরে বোবো বসে রইল একা। বয়সে ওর দিদি বড় হলেও চিরকালই নিজেই সব মনোযোগ আর গুরুত্ব এমনভাবে সিনক্রিয়েট করে নিয়েছে। এখনও ওকে ঠান্ডা করতে নাঙু চলে গেল। বোবোর দিকে তাকালই না?

সেই ছোটবেলাতেই বিরাট একটা তিমি মাছ গিলে নিয়েছিল বোবোকে। এখন তার পেটে বসে ওর হঠাৎ খুব শীত করে উঠল। মনে হল সামনে সব অন্ধকার। স্যাঁতস্যাঁতে। গা ছমছম করছে বোবোর। কেমন যেন ভয় লাগছে! ওর তো কেউ নেই। তবে, কী হবে ওর? বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এখন। ওর জীবন যেন। যেন ওর বাকি জীবন এটাই।

আর হঠাৎই অন্ধকার ছিঁড়ে একটা মুখ ভেসে উঠল ওর সামনে। বহু বছরের ওপার থেকে কে যেন গিটার নিয়ে গেয়ে উঠল:

'When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won't be afraid
No I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me...'

(Stand By Me, Benjamin Earl King)

তুমি কি আজও গান গাও? তুমি কি আজও অন্ধকারের দিকে

তাকিয়ে আমার মতো একটা মুখ দেখতে পাও? এখন কোথায় আছ তুমি? কোথায় আছিস তুই? আমায় ছেড়ে থাকতে পারিস? কীভাবে পারিস!

৫

পাগলটা হাসছে। গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। আজ মাথায় একটা ছেঁড়া টুপি পরে আছে লোকটা। হাত তুলে কীসব যেন বলছে! গাড়িটা সাইটের মেন গেটের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পর-পর ছ'টা ট্রাক ঢুকছে ভিতরে। ইট, সিমেন্ট, লোহার রড আরও নানান জিনিসপত্র ঢুকছে। তাই গেটের কাছে জটলা হয়ে আছে। ওই ট্রাকগুলো আর বোবোর গাড়ির মাঝেও বেশ কয়েকটা রিকশা, ভ্যান, অটো আর গাড়ি আটকে আছে। পুরনো বাড়ির জট পাকানো ওয়্যারিংয়ের মতো হয়ে আছে জায়গাটা। আর এসবের ভিতরে রাস্তার এই হট্টগোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাগলাটা হাত-পা নেড়ে নিজের মনে বলছে, "তোরা সব রাগ করে অনশন করতে পারিস, ইনপুট বন্ধ করতে পারিস, এবার দ্যাখ কী করে আউটপুট বন্ধ করতে হয়। করে দিলাম শালা লকআউট। নে, হর্ন বন্ধ না হলে লকআউট চলবে। চলছে চলবে। আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে নইলে, নইলে কী যে ছাড়তে হয়, কী যেন..."

সামনের জটটা খুলে গিয়েছে এবার। গণেশ গাড়িটা বাড়িয়ে দিল। পাগলটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল গাড়িটা। বোবো একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ওকে। টুপিটা খুলে মাথা চুলকোচ্ছে লোকটা। রাস্তার দিকে চোখ। মনে হচ্ছে কিছু খুঁজছে। কী খুঁজছে? কী ছাড়তে হয় সেটা খুঁজছে? বোবোর ইচ্ছে হল গাড়ি থেকে নেমে এক ছুটে পাগলটার কাছে গিয়ে বলে দেয় কী ছাড়তে হয়। বলে দেয়, ওরও ওই জিনিসটা ছাড়তে খুব ইচ্ছে করে আজকাল।

বোবো জানে সে থাকলে পাগলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াত। কথা বলতে চেষ্টা করত। কিছু একটা খাবার হয়তো কিনে দিত লোকটাকে। সে তো এমন করত। কত করত! ওরা যখন ঘুরতে বেরত, তখন এমন কোনও মানুষ দেখলেই সে এসব করত। বলত, "ওরাও তো মানুষ, বল?"

বড্ড বেশি 'মানুষ মানুষ' করত বলেই কি জীবনে তেমন কিছু করতে পারল না? তথাকথিত মানুষরা কি তাই তাকে সরিয়ে দিল জীবন থেকে? ওর কাছ থেকে? আজকাল কী হয়েছে বোবোর? সবসময় কেন যে তার কথা মনে পড়ে! মাঝখানের কয়েকটা বছর তো দিব্যি নিজের মনকে শক্ত করে চালিয়ে দিল। তবে? তবে এখন কেন এমন হচ্ছে? কেন এত মনে পড়ছে সেই চোখ দু'টোকে? থুতনির কাছের ওই তিলটাকে? কেন সবকাজের ফাঁকে এসে সে ওই দুঃখী চোখ দু'টো তুলে তাকাচ্ছে অমনভাবে? কেন আবার কোনও কথা না বলে কোনও বন্ধন ছাড়াই এভাবে বেঁধে ফেলতে চাইছে? কেন টুনটুনিটা এমন করে নেচে চলেছে? কী হয়েছে তার? আর কী বা হয়েছে বোবোর নিজের?

গেট দিয়ে ঢুকে পাশের বড় দেবদারু গাছটার কাছে দাঁড়াল গাড়িটা। বোবো গাড়ি থেকে নামতে যাবে, এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। বোবো গাড়িতে বসে পড়ল আবার। ফোনটা বের করে নম্বরটা দেখল। কীসের নম্বর এটা? কার নম্বর? অচেনা নম্বর চট করে ধরে না বোবো। ও কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর ফোনটা রিসিভ করে কানে লাগাল, "হ্যালো।"

"হ্যালো, শ্রীমতী বৈষ্ণবী সেন আছেন?" গলাটা পাতলা। কিছুটা যেন কনফিডেন্সের অভাব।

"বলছি। আপনি?"

"আমি নারু চক্রবর্তী।"

"নারু?" বোবো দু'মিনিট থমকাল, তারপর মনে পড়ল ওর, "আরে আপনি! বলুন। আমার তো আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। আমি অফিসের একজনকে দিয়ে খবরও পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনি অসুস্থ, তাই আর ডিস্টার্ব করিনি।"

"হ্যাঁ, মানে, বয়স হয়েছে তো, তাই বুকে একটা, ইয়ে আপনি কী বলতে চান যদি একবার বলতেন। আমি সেজন্যই ফোন করেছি।"

"এভাবে তো ফোনে সেসব কথা হয় না। আমি যাব, গিয়ে কথা বলব। শুধু একটা রিকোয়েস্ট, কিছু বলার থাকলে আপনি এসে বলবেন। আপনার ওই জীবনবাবু বা সংগ্রামবাবুকে পাঠাবেন না। কারণ আমার তো আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাই আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আসলে আমি অসুস্থ ছিলাম বলেই, মানে..." নারু ইতস্তত করল, "ব্যাপারটা হয়েছে কী, আমি আসলে আর একটু বেশি দাম এক্সপেক্ট করছিলাম। মানে একজন তো আপনার চেয়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি দিচ্ছে। তাই মানে..."

বোবোর চোয়াল শক্ত হল। লোকটাকে যতটা সহজ ভেবেছিল ততটা তো সহজ নয়! ও বলল, "দেখুন আমি আপনাকে দু'লাখ অলরেডি অ্যাডভান্স দিয়েছি। তার পেপারও আছে আমার কাছে। এখন আপনি যদি এমন বলেন..."

"আমি সুদ সমেত যদি ফেরত দিয়ে দিই? তবে?"

বোবোর মাথাটা গরম হয়ে গেল এবার, ও ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "আমি সুদের কারবার করি না নারায়ণবাবু। আর কনট্র্যাক্ট ছিল যদি পরের ছ'মাসের ভিতর আমি টাকা না দিই তবে আপনি ওই জমিটা অন্য-কাউকে দিতে পারবেন। সেখানে মাত্র দু'মাস হয়েছে। আর আপনার দিক থেকে কোনও বাধা থাকলে ওই ছ'মাসের ক্লজটাও খাটবে না। মনে পড়ছে আপনার? আপনি বললে কালকেই আমি টাকা মিটিয়ে দেব। এই মর্মে আমি আপনাকে দু'টো রেজিস্টার্ড চিঠিও দিয়েছি। তার রসিদও আমার কাছে আছে। দেখুন প্রবলেমটা আপনার দিক থেকে। আপনি জমিটা পুরো দিতে পারছেন না। ঠিক না?"

"আরে সে তো ওই জানোয়ারটার জন্য? আমার মেজো ভাইয়ের ছেলে। ওর জমিটা এমন একটা জায়গায় যে, ও মত না দিলে..." নারু গম্ভীর হয়ে গেল।

"আমায় এসব বলে লাভ নেই। আমার তাড়া নেই। আর্কটিক ভিলেজের প্রজেক্টটা শেষ হতে এখন সময় লাগবে। আপনি গোটা জমিটা নেওয়ার চেষ্টা করে যান, আমি ওয়েট করব। আর আপনি অন্য কিছু করার চেষ্টা করলে জানবেন বিপদটা আপনার। কেমন?" লোকটাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে কট করে ফোনটা কেটে দিল বোবো।

মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে। কী ফালতু লোক রে বাবা। ডোঙারিয়া জায়গাটা এই সাইটের থেকে বেশি দুরে নয়। মনে হল লোকটার বাড়িতে গিয়ে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে আসে। ইয়ার্কি পেয়েছে। নিজে জমি দিতে পারছে না, আর উলটে চাপ দিয়ে দাম বাড়াতে চাওয়া? মামদোবাজি! নিজেকে সংযত করল বোবো। এই সামান্য কারণ নিয়ে মাথা গরম করার মানেই নেই কোনও। প্রায় বিকেল হয়ে এল। গাড়ির বাইরের পৃথিবী যেন গরম তেলের ভিতর ফুটছে। সারাদিন এসি-র ভিতরে থাকা বোবোর এই গরম সহ্য হয় না একদম। ওর হালকা গোলাপি ত্বক গাঢ় গোলাপি হয়ে ওঠে এই গরমে। ছোট থেকেই এমন ছিল ওর। কলেজজীবনে গরমে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেলেই সে বলত, "লাজে রাঙা হল কনে বউ গো/ আজ মালা বদল...' বাদ দে, মালা না বদল করে রেজিস্ট্রি করলেও হবে, কী বল!"

মানুষ চলে যায়, আর যেতে-যেতে কত কী যে ফেলে রাখে! তার পুরনো জামা, চশমা, ঘড়ি, তার লেখার কলম, স্মৃতি। কত স্মৃতি। আর হঠাৎই, খুব কাজের ভিতর, প্রচণ্ড ব্যততার ভিতর ছোট্ট একটা কাগজ, টেব্‌লে উলটে রাখা চশমা বা খুব সামান্য এক ফালি রোদ কীভাবে যে মনে পড়ায় সব!

এই গরমের হলকা, হাজার কাজের ভিতরেও কেমন যেন ফিরিয়ে আনল তাকে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে-উঠতে দু'-চারটে ধাপ মনে-মনে এলোমেলো হয়ে গেল বোবোর।

তবু এলোমেলো হতে দিতে নেই। জীবন ছোট্ট মেয়ের চুলের মতো। তাকে ভাল করে আঁচড়ে, বেঁধে, গুছিয়ে রাখতে হয়, নইলে নষ্ট হতে দেরি হয় না।

এই সাইটে ওর অস্থায়ী অফিসটায় একটা এসি লাগানো আছে। সেই ঘরে ঢুকে যেন স্বস্তি পেল বোবো। দেখল ঘরের আর-একটা কোনায় নাঙু বসে আছে একটা সোফায়। তার সামনে ওদের ওভারসিয়ার বসে রয়েছে। লোকটা লেবারদের কাজ দেখাশোনা করে। নাম তপন। আর ওর সঙ্গে বসে আছে লেবার সর্দার। নাঙুকে দেখে মনে হল দু'জনের সঙ্গে বেশ সিরিয়াস কিছু নিয়েই আলোচনা করছে।

বোবো গিয়ে দাঁড়াল সামনে। ভুরু তুলে জানতে চাইল কী হয়েছে? নাঙু একটা কাগজ হাতে নিয়ে দেখছিল। সেটার থেকে চোখ তুলে বোবোকে দেখে পাশের খালি সোফাতে বসার ইঙ্গিত করল। বোবো বসে নিজের তিনটি মোবাইল টেব্‌লে রাখল।

"তো? সব ঠিকই আছে। তবে? প্রবলেমটা কী হল?" নাঙু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল।

তপন বলল, "কিন্তু ওদের কথা হল, এই ওভারটাইমের টাকায় হচ্ছে না।"

"মানে?" নাঙু কিছু বলার আগেই বিরক্তিতে বলে উঠল বোবো, "হচ্ছে না মানে? আপনারা কি এখানে এসেছেন এই ওয়েজ নিয়ে কথা বলতে নাকি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম," তপন বলল, "আমার তো কোনও প্রবলেম নেই। সর্দার বলছে যে, ওদের টাকা কম হচ্ছে। ওভারটাইমের টাকা এত অল্প হলে ওরা রাতে কাজ করতে পারবে না।"

"আরে?" বোবো অবাক হল, "গত কয়েকমাস তো এভাবেই কাজ হয়েছে। আর রাত মানে কী? রাত সাড়ে আটটা অবধি কাজ হয়। আর কাজের আগের কনট্র্যাক্ট তো ওদের সঙ্গে কথা বলেই হয়েছে। তা হলে এখন প্রবলেম কোথায়?"

নাঙু বলল, "আমি তো সেটাই বলছি। সব জেনেবুঝেই তো হয়েছে। সর্দার নিজে পড়াশোনা জানে। কনট্র্যাক্টও বাংলাতেই হয়েছে। সব পড়েই তো সই করেছে?"

সর্দার গম্ভীরভাবে বলল, "আমরা জানব কী করে যে, আপনি আমাদের কম রোজে কাজ করাচ্ছেন?"

"এটা কোনও কথা হল?" নাঙু বলল, "তোমার এতদিনের অভিজ্ঞতা। তুমি আমাদের সঙ্গে কত বছর কাজ করছ, আর আজ এমন বলছ!"

"কী করে জানব আমরা যে, এখানে সব জায়গায় রেট বেড়ে গিয়েছে?" সর্দার গোঁ ধরে রইল।

"আরে এমনিতেই আমরা বাহাইন্ড শেডিউল যাচ্ছি," বোবো বিরক্তিতে উঠে দাঁড়াল, "আর এমন করলে হবে? সব কনট্র্যাক্ট অনুযায়ী হচ্ছে তাতেও আপনাদের সমস্যা। কেন এমন করছেন বলুন তো?"

সর্দার মুখ গোঁজ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "অন্য কোম্পানি তাদের প্রজেক্টে শুনেছি এর চেয়ে বেশি টাকা দেয় ওভারটাইম করলে।"

"শুনেছ? মানে?" নাঙু অবাক হল, "কে কী বলছে তার উপর নির্ভর করে তুমি এসব করছ?"

সর্দার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কাচের দরজায় আওয়াজ হওয়ায় সকলেই একসঙ্গে ঘুরে দেখল, ইক্কি।

ইক্কি! চোয়াল শক্ত করল বোবো। এখানে কী করছে ও?

"তুমি?" বোবো জিজ্ঞেস করল।

"কাছেই একটা কাজে এসেছিলাম। তাই ভাবলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দিই," ইক্কি হেসে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল।

বোবো আবার সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা আপনি একটা সামান্য কথার উপর নির্ভর করে এমন করছেন? আরে, কত কাজ বাকি! লোকে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করেছে। আমাদের একটা বাজেট আছে। আপনার সঙ্গে একটা কনট্র্যাক্টও আছে। আপনি ওভারটাইমের টাকা বাড়ান বললে কী করে হবে?"

"ক্যায়া?" ইক্কি হঠাৎ বলে উঠল, "আরে কনট্র্যাক্টের বাইরে টাকা চাইছে? ব্লাডি সাকার। পুলিশে দিয়ে দাও এদের।"

"ইক্কি চুপ করো," বোবো বিরক্ত হল।

"কেন চুপ করব? এরা তোমায় লুঠতে আসবে আর আমি চুপ করে থাকব? অ্যাম আই আ লুজার।"

সর্দার ভুরু কুঁচকে তাকাল বোবোর দিকে, বলল, "আপনি বিবেচনা করে সাতদিনের মধ্যে কিছু একটা করুন, না হলে..."

"না হলে?" ইক্কি চোয়াল শক্ত করে তাকাল সর্দারের দিকে, "না হলে হোয়াট? হোয়াট? কী করবে তোমরা?"

"আমাদের গেরামের লোক পেয়ে আপনারা শহরের লোকেরা..." সর্দার কিছু বলতে যাচ্ছিল।

"শাট্ আপ," ইক্কি চিৎকার করে উঠল, "কাট দ্য ক্র্যাপ। ওসব গ্রাম শহরের ফালতু সেন্টিমেন্ট মারাবে না। গ্রামের তোমরা সব দুধ কা ধুলা হুয়া, না? জমির জন্য খুন-জখম লেগেই আছে। এ ওর ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ভোটের আগে সব মুখে গামছা বেঁধে বন্দুক হাতে মারামারি করছে। রেপ করে ধানক্ষেতে ফেলে রাখছে ছোট মেয়েদের, আর গ্রামের আমরা সবাই ইনোসেন্ট, শহরের তোমরা সব শয়তান! ওসব ফালতু কথা বাদ দাও। টাকাটা আমরা চিনি, তোমরাও চেনো। কনট্র্যাক্টের পরও টাকা চাইছ, আবার বড়-বড় কথা? এক টাকাও পাবে না। ভাগো।"

সর্দার উঠে বোবোর দিকে তাকাল, "উনি কি সব ঠিক করবেন? আর শহরের কেচ্ছা শুরু করব?"

ইক্কি বলল, "ও কী বলবে? ও..."

"প্লিজ ইক্কি," বোবো চিৎকার করে উঠল, "স্টে আউট অব ইট," তারপর সর্দারকে বলল, "আপনি একটু দেখুন। কাজ ভাল করে করুন, একটা ঠিক বন্দোবস্ত হবে।"

সর্দার সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল, তারপর বেরিয়ে গেল। তপনও নাঙুর সম্মতি নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বোবো ইক্কিকে বলল, "তোমায় কে কথা বলতে বলেছে এসবের মধ্যে?"

"তুমি আমায় ওই লোকটার সামনে এমন অপমান করলে কেন?" ইক্কি উলটে গলাটা কঠিন করল।

"কে আসতে বলেছে তোমায় আমার কাজের জায়গায়?" বোবোও চোখে চোখ রাখল ওর।

"মানে? আমি ফালতু নাকি? আমি কে হই তোমার?"

"আপাতত কেউ নও," বোবো মুখ ঘুরিয়ে নিজের ডেস্কের দিকে হাঁটা দিল।

"ক্যায়া বোলি তু সালি?" ইক্কি পিছন থেকে গিয়ে এক ঝটকায় বোবোকে নিজের দিকে টানল।

প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা আর বিশাল চেহারার ইক্কির সামনে বোবো যেন একটা কেমন বেলুনের পুতুলের মতো! ও ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

ইক্কি বলল, "বোল ক্যায়া রহি হ্যায় তু?"

"ওকে ছেড়ে দাও," নাঙু এসে দাঁড়াল সামনে, "ছাড়ো বলছি।"

ইক্কি লালচোখে তাকাল নাঙুর দিকে তারপর ছেড়ে দিল বোবোর হাতটা।

বোবোর মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলছে! যেন কেউ সমস্ত লাভা ভরে দিয়েছে ওর বুকের ভিতরে। উপায় থাকলে ও ইক্কির হাত দু'টো ভেঙে দিত আজ।

বোবো বলল, "চলে যাও তুমি, আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবে না এখানে।"

ইক্কির মুখটাও লাল হয়ে গিয়েছে। ও নিজের সুটটা ঠিক করে চুলে হাত বোলাল। তারপর মাথা নাড়িয়ে ধারালো চোখে তাকাল বোবোর দিকে, বলল, "ইট ইজ নট ওভার," তারপর বেরিয়ে গেল কাচের দরজাটাকে প্রায় ধাক্কা মেরে খুলে।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বোবোর মনে হল এত বড় জানোয়ারটাকে ও কী করে রেখেছে ওর জীবনে।

"তুই ঠিক আছিস?" নাঙু এসে দাঁড়াল কাছে, "লেগেছে?"

মাথা নাড়ল বোবো। যেখানে ওর ব্যথা সেটা কি কেউ আদৌ দেখতে পাবে?

"ম্যাডাম," বিকাশের গলার স্বরে মুখ ফেরাল বোবো। কাচের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিকাশ। "ম্যাডাম, ওই লোকটা এসেছে আবার। ওই সাপ্লায়ারটা। খুব নাছোড়বান্দা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

"এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? কোথাকার কে এক পাতি সাপ্লায়ার, তার সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে?" বোবো চিৎকার করল, "ভাগিয়ে দাও, ভাগিয়ে দাও ওকে।"

"কিন্তু ম্যাডাম, লোকটা খুব ঘুরছে। একবার যদি..."

"হোয়াট হেল!" বোবো ভুরু কুঁচকে আরও চিৎকার করল, "তুমি বাংলা বোঝো না?"

"ওকে ম্যাডাম, ওকে..." বিকাশ তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

"কী হচ্ছে বোবো?" নাঙু বলল, "মাথা ঠিক কর। এমন কেউ করে? ইক্কি অসভ্য হতেই পারে। ওর রাগটা অন্যের উপর কেন ঝাড়বি? দিস ইজ আনফেয়ার। এমন করিস না।"

বোবো চোয়াল শক্ত করল, "নাঙু সবকিছুরই একটা সময় থাকে। বিকাশকে বারবার বলেছি পেটি কাজে আমায় না জড়াতে। শোনো কথা? কীসব লোক রিক্রুট করেছি আমরা? এভাবে কাজ হবে?"

নাঙু এগিয়ে এসে বলল, "তা বলে এমন রাগ করবি? পাগলি তুই? এমন তো তুই নোস। কেন নিজেকে এমন প্রমাণ করার চেষ্টা করছিস?" তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ডাকল, "বিকাশ, বিকাশ, পাঠিয়ে দাও ভদ্রলোককে।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া বিকাশ ফিরে এল উপরে। বলল, "ও তো চলে গিয়েছে। হয়তো ম্যাডামের গলার আওয়াজ পেয়েই... মানে..."

"চলে গিয়েছে?" নাঙু ভুরু কোঁচকাল, "দিস ইজ আনফেয়ার। চল তো দেখি কোথায় গেল। মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মতো অন্যায় কিছু হয় না।"

নাঙু বিকাশকে নিয়ে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে।

বোবো জানালার দিকে হেঁটে গেল ধীর পায়ে। সবকিছুই কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে! কিছুতেই কিছু ঠিক বাগে আনতে পারছে না। আনন্দ কমে যাচ্ছে জীবন থেকে। হারিয়ে যাচ্ছে হাসি।

বোবো নিজের মনেই বলল, "আমার হাসি কি তুই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিস সম?"

আমার গল্প

প্রথম ভাগ

যেন তুলোর বল লাফিয়ে পড়ল আমার উপর আর অবাক হয়ে দেখলাম তার ছোট্ট গুলির মতো চোখ দু'টো কী দারুণ চকচক করছে! আমি বিছানা থেকে আমার ঘরটা দেখলাম। জানালাগুলো সব বড়-বড় নীল পরদা দিয়ে ঢাকা। আর তার থেকে আসা আলতো আলোয় কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সব! ঘরের পাশেই একটা চওড়া ব্যালকনি। সেই ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবো। আমারই একটা বড় সাদা শার্ট পরে রয়েছে। যদিও মোমের মতো পাদু'টো নিরাভরণ। শুধু লম্বা ঝুলের শার্টটা নেমে আছে থাই অবধি। আমার যে কী ভাল লাগছে ওকে দেখতে! এ মেয়ে কোন পৃথিবী থেকে এল আমার কাছে? কেন এল আমার জীবনে? কেন এমন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়!

আমি চোখ না সরিয়ে তাকিয়ে রইলাম বোবোর দিকে। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে, একটা পা ভাঁজ করে তুলে দু' হাতে কফি মাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবো। ওর ওই ছোট্ট ঠোঁটদু'টো দিয়ে অল্প-অল্প চুমুক দিচ্ছে কফিতে। বড়-বড় চোখ তুলে কী এত দেখছে বাইরের দিকে তাকিয়ে?

আমার রাগ হচ্ছে। কী আছে এত বাইরে, যে অমনভাবে তাকাতে হবে? আমি কি কেউ নই? তবে আমার দিকে না তাকিয়ে কী এত দেখছে বোবো?

আমি পাশ থেকে একটা বালিশ তুলে আস্তে ছুড়ে মারলাম বোবোর দিকে। কিন্তু ফসকালাম আর বালিশটা গিয়ে লাগল পাশের দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা একটা পোর্সেলিনের প্লেটের গায়ে। খুব জোরে মাটিতে পড়ল প্লেটটা। খনখন করে বিকট শব্দ হল একটা। আর চোখ খুলে আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম বিছানায়।

তীব্র একটা আলো। ছোট্ট পরদা লাগানো বড়-বড় জানালাগুলো দিয়ে কাচের পাতের মতো রোদ এসে গেঁথে গেল চোখে। আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম।

কীসের শব্দ হল এটা? একটা কাচের প্লেট ভাঙার শব্দ এত হয় নাকি? আমি চোখ খুললাম আবার। বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা কিন্তু ওখানে কেউ নেই। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো প্লেটটা ঠিক আছে তো! তবে? আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। আরে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে যে গিটারটা! ও, তাই এত আওয়াজ!

দু' হাতে চোখ কচলে আমি ভাল করে তাকালাম। স্বপ্নটা এত সত্যি ছিল যে, আমার বুকটা এখনও কেমন যেন নরম কাদা-মাটির মতো লাগছে। মুখটা বিস্বাদ হয়ে আছে। এইমাত্র হাত দিয়ে ধরতে পারছিলাম যাকে সে কোথায় গেল? হারিয়ে গেল কোথায় আবার?

আমি স্ট্রিং ছেঁড়া গিটারটাকে দেখলাম। দেখলাম তার পাশে বসে থাবা চাটছে জন। সকালটাই যদি কারও এমন হয়, তবে বাকি দিনটা কেমন যাবে সেটার জন্য কি আর পেপারে 'আজকের রাশিফল'

দেখার কোনও দরকার আছে?

সকালে বিছানা ছেড়ে নামতে আমার ভয় করে। মনে হয় বাইরে একটা রাক্ষস হাঁ করে বসে রয়েছে আমায় গিলে খেয়ে নেবে বলে। রোজগারের জন্য এ অফিস, ও অফিস ঘুরতে-ঘুরতে মনে হয় রাক্ষসটা আমায় দেখছে আর মনে-মনে হাসছে। মনে হয় ও অপেক্ষা করছে কখন আমায় গিলবে তার জন্য। তবু, মরণকূপেও রোজ মানুষ গাড়ির খেলা দেখায়। ভাঙা কাচ খেয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন করে মানুষ! আর আমি সমন্বয় চক্রবর্তী তো নেহাতই চুনোপুঁটি।

আসলে চুনোপুঁটিও নই। তাদেরও ভাজা করে খেলে একটা আলাদা আনন্দ আছে। আমার ক্ষেত্রে সেটাও নেই।

নিজের সম্বন্ধে আমার অ্যাসেসমেন্ট শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি কী ভুলভাল টাইপ! কিন্তু কী করব? পাঠক ভগবান। তাকে তো আর ঢপ মেরে যমরাজের ফ্রাইংপ্যানে পড়ে তাঁর স্টার্টার হতে পারি না! তাই সত্যিই আমি এমন।

তবে জান, আগে কিন্তু আমি এমন ছিলাম না। আগে আমার ভিতর বেশ একটা গরম পরোটা, মরুভূমির ক্যাকটাস বা জওয়ানি সিরিজের ছবির মতো ধার ছিল। কিন্তু বোবো চলে যাওয়ার পর থেকে পরোটা ঠান্ডা মেরে গিয়েছে, উটে না বেছেই ক্যাকটাস মুড়িয়েছে আর জওয়ানি সিরিজ ফ্লপ করে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে পর্ন সাইট।

আমি এখন বেঁচে থাকি। রোজগারের জন্য খুব খাটাখাটনি করি, লোকের কাজে লাগার চেষ্টা করি, তবু আমার ভিতরটা কেমন যেন মরে গিয়েছে।

পিঁড়ি বলে, "গুরু, তুমি পুরো ঝাড় কেস, এমন ড্যাম্প দেশলাই হয়ে থাকলে হবে? চারদিকে থিকথিক করছে অপরচুনিটি, কোথায় খাবলে ধরবে, না সারাদিন এলিজি লিখছ বসে-বসে। ওসব কাব্য লেকের ধারের কবিদেরই মানায়। এই দু'হাজার বারোর বঙ্গসন্তানকে মানায় না। কোথায় ফাটিয়ে বাঁচবে তা নয়, সাতের দশকের আর্ট ফিল্মের নায়িকার টিবি রোগী ভাই হয়ে বসে আছ। জান না মহাপুরুষ বলেছিলেন, ওঠো, জাগো, ব্রাশ করো। তবে?"

পিঁড়ি একসময় আমার ছাত্র ছিল। ওকে আমি ইংরেজি পড়াতাম। কিন্তু আমার পড়ানোর গুণেই হোক বা ওর একক কৃতিত্বেই হোক, অনার্স ও রাখতে পারেনি। ক্যানিং ষ্টিটে ওর বাবার বিশাল দোকান আছে ইলেকট্রিকাল গুডসের। সেখানেই কাজকম্ম করে এখন। তবে আমার কাছে আসে নিয়মিত। আড্ডাও দেয়। পিঁড়ি আমার চেয়ে আটবছরের ছোট। এখন ওর চব্বিশ চলছে, তবে দেখলে আরও ছোট মনে হয়। পাতলা, ফরসা চেহারার পিঁড়িকে এখনও যোলো বলে চালিয়ে দেওয়া যায় সহজেই।

আমার পিঁড়ির কথা মনে পড়ল এখন। জেগে তো গিয়েছিলামই, এবার উঠলাম। ব্রাশ করতে হবে।

এই ফ্ল্যাটটা আমার মামার। মামা থাকে কানাডায়। তিন-চারবছর পর একবার করে কলকাতায় আসে। এই আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটটা তাই খালিই পড়ে থাকত। মেনটেন হত না। নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মেঝে, সিলিং, দেওয়াল। তাই গতবার মামা এসে সব সারাই করিয়ে আমায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে এখানে। বলেছে, "আমার একমাত্র দিদির একমাত্র ছেলে তুই। এমন বড় ফ্ল্যাট থাকতে তুই ফালতু মেস বাড়িতে থাকতে যাবি কেন? তুই এখানে থাকবি। তবে হ্যাঁ, রান্না, ইলেকট্রিক এসবের খরচ তোকেই চালাতে হবে।"

এটা মামা না শালা? মনে-মনে খুব গাল দিয়েছিলাম। মেস বাড়ির ভাড়াটা বাঁচবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা এখানের ইলেকট্রিক বিলেই বেরিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাও আমি ফ্ল্যাটে এলাম কেন? কারণ সেন্টিমেন্ট। আমার বস্তা-পচা সেন্টু খাওয়া মন। মা মারা গিয়েছিল আমার থার্ড ইয়ার পরীক্ষার কয়েকদিন পর। কিন্তু মারা যাওয়ার দিন পর্যন্ত ওই মামাটির প্রতি আমার মায়ের অন্ধ ভালবাসা ছিল। আসলে মায়ের মাও অনেক আগে মারা যায়। মা একরকম কোলে করেই মানুষ করেছিল মামাকে। সেই মামা পড়াশোনা করে খুব বড় চাকরি পেয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল মায়ের নাগালের অনেক বাইরে। এতটাই বাইরে যে, মামা আর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু মায়ের কাছে ওই দূরত্ব যেন কোনও দূরত্বই ছিল না। রোজই মামার কথা বলত মা।

তবে মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মামা এসেছিল। মায়ের খাট ধরে বসে কেঁদেছিল বাচ্চাদের মতো। যতদিন আমি অশৌচ পালন করেছি, মামাও করেছিল। শ্রাদ্ধের দিন উপোস করেছিল সারাটা সময়। কারও সঙ্গে কথা বলেনি। মায়ের ছবির সামনে বসেছিল ঠায়। শুধু রাতে বলেছিল, "আর-কেউ রইল না রে আমার! এবার আসলে আমার মাতৃবিয়োগ হল।"

সেই মামাটার জন্যই আমি এই ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি। এখনকার এই হিসেবি, পয়সা জপ-করা মামার জন্য নয়।

ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখলাম আমি। সাড়ে ন'টা বাজে। আজ একটু বেশি ঘুমিয়েছি। উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছে আমার। তবে চিন্তা নেই। আজ খুব-একটা কাজ নেই। দেরি করে বেরোলেও ক্ষতি হবে না।

আমি ব্যবসা করি। ছোট্ট একটা কোম্পানি আছে আমার। জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারের ব্যবসা আমার। নানা অফিসে ঘুরে আমি তাদের দরকারি স্টেশনারির অর্ডার নিই আর তারপর তা সাপ্লাই করি। ক্যানিং ষ্টিট, ওয়েলিংটন, বড়বাজারে সব আমার পাইকারি দোকান ঠিক করা আছে। তাদের থেকে মাল তুলে আমি অফিসে-অফিসে পৌঁছে দিই। এ ছাড়া সন্ধেবেলা আগে আমি স্টুডেন্ট পড়াতাম। কিন্তু এখন আর পড়াই না।

তবে এই রোজগারে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কেটে যায় আমার। ভালভাবে কাটে না, কারণ বজবজের কাছে ডোঙারিয়ায় আমার বাবা আর বোন থাকে। তাদের খরচও আমাকেই চালাতে হয়।

তাই ফালতু খরচ আমি করি না। ম্যাক্সিমাম রাস্তা আমি হেঁটেই মেরে দিই। দুপুরের খাওয়াটা স্কিপ করি। জামা-কাপড়ের অপটিমাম ব্যবহার করে তবেই ছাড়ি। মানে এতটাই অপটিমাম করি যে, একবার সেই জামা দিয়ে একটা স্টিলের বাটি নিতে যাওয়ায় সেই লোকটা বলেছিল, "বাটিটা কি খাওয়ার জন্য নেবেন, না এটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন?"

অপমান। অপমান গায়ে মাখি না আমি। অত সময় আমার নেই। সেই সময়টায় পয়সার ধান্দা করলে কাজে দেবে।

অন্যদিন হলে আমি পাশের ফ্ল্যাটের কুসুম মানে কুসি বউদির কাছে খেজুর করতাম। কারণ তা হলে টোস্ট আর চা-টা হয়ে যেত। কিন্তু আজ স্বপ্নটা সব গন্ডগোল করে দিয়েছে। এত স্পষ্ট আমি বোবোকে দেখলাম যে, মনে হচ্ছে যেন ওকে আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে পারব। এখনও আমার ভিতরটা কাঁপছে। আবার সেই গাড্ডা-ফিলিংটা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সব ফালতু।

আমি আজ নিজেই চা করে দু'টো বিস্কিট দিয়ে খেলাম। সস্তা, বাজে বিস্কিট। মনে হচ্ছে যেন আটার গোলা খাচ্ছি। তবে গরীবের অত জিভ হলে চলে না। যা পাওয়া গিয়েছে তাতেই মানিয়ে নিতে হয়।

চা-টা শেষ করে ভাবলাম দেরি করব না। তার চেয়ে যে-চারটে অফিসে মাল সাপ্লাই করতে হবে সেগুলো তো আমি পিঁড়িদের দোকানে কালকেই গিয়ে রেখে এসেছি, সেখান থেকে নিয়ে কাজ সেরে নিই। তারপর না হয় একটু হাত-পা ছড়ানো যাবে বা কয়েকটা জায়গায় কিছু পেমেন্ট বাকি আছে, সেখানে টাকার তাগাদায় যাওয়া যাবে। কী একটা স্বপ্ন দেখলাম তার জন্য নিজের পেটে লাথ মারব নাকি। তবে মেয়েদেরও বলিহারি যাই, তোরা জীবনে যখন আসবি না ঠিকই করে নিস, তখন স্বপ্নে আসার কি কোনও দরকার আছে? ফালতু-ফালতু আমাদের হয়রানি না!

কাপ আর চায়ের বাসন ধুয়ে রেখে স্নানে যাব বলে গামছাটা সবে হাতে নিয়েছি, এমন সময় টিং-টং করে কলিং বেলটা বেজে উঠল। এখন আবার কে? আমার একটু বিরক্তই লাগল। যখন কাজে যাব বলে মনস্থির করি তখন বাধা এলে আমার ভাল লাগে না একদম।

আমি বিরক্তিটা চেপে দরজা খুললাম। আরে, গজা!

গজানন্দ আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। এমন দুঃখী মুখের ছেলে পৃথিবীতে আর-একটাও আছে কি না সন্দেহ। দেখলেই মনে হয় পেয়াসা ছবির গুরু দত্ত। তবে এতে ওরও দোষ নেই। ওর জীবনটাও বেশ কঠিন। সংসারে বাবা নেই। দুই বোন আর মায়ের ভার। এক বোন কলেজে পড়ে, অন্যজন কিছুই না করে বাড়িতে বসে। ওর মাও শয্যাশায়ী। গজা একটা ছ' হাজার টাকার চাকরি করে। বাবার পেনশন আর ওর মাইনে মিলিয়ে কোনওমতে চলে ওদের। তবে ওটাকে যদি আদৌ চলা বলে, মানে, সব মিলিয়ে যে-কোনও গম্ভীর ও মনোজ্ঞ বাংলা উপন্যাসের প্লট হতেই পারে ওর জীবন। কিন্তু আমাদের উপন্যাসটা যেহেতু গম্ভীর বা মনোজ্ঞ নয়, তাই গজাকে দেখে আমার চারপাতা সিমপ্যাথির বদলে এক শব্দের বিরক্তিটাই হল।

আমি পাওনাদারদের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিমায় বললাম, "তুই? এসময়? আমি তো বেরোব।"

গজা আমার দিকে তাকাল ছলছল চোখে। প্লিজ, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ও এভাবেই তাকায়।

বললাম, "কী হয়েছে? তোর অফিস নেই?"

"মা," গজার গলা শুনে আমার ধর্মেন্দ্রর সিনেমার কথা মনে পড়ল।

"কী হয়েছে?" আমার বিরক্তিটা বাড়ছে।

"ডাক্তার বলেছেন," গজা একটা পজ নিয়ে আমায় ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর আটত্রিশ ডিগ্রি বেঁকে বলল, "অপারেশনটা করাতেই হবে। গলব্লাডার ছাড়াও ইউটেরাসেও প্রবলেম আছে।"

"তাই? অ," আমি দরজাটা বন্ধ করে ঘরে এলাম।

"তা তুই কিছু ভাবলি?" গজা এবার চল্লিশ ডিগ্রি ঘুরল।

"আমি? কী ব্যাপারে?"

"বাঃ ভুলে গেলি? সেই যে বলেছিলি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিবি মায়ের চিকিৎসার জন্য। সেটা কত তাড়াতাড়ি দিতে পারবি তুই?" গজার গলায় এবার পাওনাদারের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি।

পঞ্চাশ হাজার? আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

"ভুলে গেলি সম? সেই যে গতমাসে আমাদের বাড়ির ছাদে মদ খেতে খেতে বললি, মাসিমার চিকিৎসার জন্য আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব। মনে নেই তোর? পিঁড়ি ছিল তো সামনে। পরে মাকেও তো বললি। তাই তো মা আজ বলল তোকে এসে বলতে। কী রে, এই সম?"

মদ। বিয়ার যদি মদ হয়, তো মদ। আমার আসলে ওসব সহ্য হয় না। কিন্তু সেদিন পিঁড়ি বিয়ার নিয়ে এসে এমন জোরাজুরি করল যে, আমি না করতে পারিনি। গজাদের বাড়ির ছাদে বসে মাছভাজা দিয়ে আমি খেয়েছিলাম দু'টো বিয়ার। তাতেই আমার সর্বনাশ হয়েছিল। সেন্টু খেয়ে কী বলতে কী বলেছি তার জন্য। এখন আমায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। এ তো মহা গেরো!

গজা বলল, "মায়ের তোর উপর অনেক আশা রে। এমনকী বোন দু'টোও বলল সমদা যখন বলেছে তখন কিছু করবেই। কী রে সম, কবে দিতে পারবি টাকাটা? তুই না দিলে যে আমি মরে যাব!"

মায়ের আশা, বোনেদের ভরসা। তোদের মোহনবাগানের আমি কি ব্যারেটো যে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আমার উপর ভরসা করছিস! কিন্তু না-ও তো করতে পারছি না। কেন পারছি না? কেন না করতে পারছি না আমি? তোদের দায় কেন আমায় নিতে হবে? কেন একটা মাতাল লোকের কথায় তোরা বিশ্বাস করেছিস?

ফেব্রুয়ারির উনত্রিশ তারিখ আজ! গরম তেমন পড়েনি, তবু কুলকুল করে ঘাম হচ্ছে আমার। উনত্রিশ তারিখ বলেই কি স্বপ্নটা দেখলাম! জন্মদিন বলেই কি বোবো এল আমার কাছে। এই দিনটা এলেই কি আমার মনখারাপ করতে নানা বাজে ঘটনা ঘটাতে থাকে বিধাতা পুরুষ?

চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মনে হচ্ছে চোখ খুললেই বিপদে পড়ব। পঞ্চাশ হাজার টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকা! কোথায় পাব আমি? হে গুরু দত্ত কেন এমন মলিন মুখ তোমার? কেন এত পেয়াস? আমি টাকা না দিলে তুমি মরে যাবে কেন? একবারও কি ভাববে না তোমার অতগুলো টাকা দিতে গেলে আমার যে মরার খরচও জুটবে না!

২

"তুমি শালা একটা পেঁচো মাতাল," পিঁড়ি বিরক্ত মুখে বলল আমায়।

"কেন?" সন্ধের আবছায়ায় পিঁড়ির মুখটা কেমন যেন লাগছে! আমাদের পাড়ার আলোগুলো ইদানীং খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই সন্ধে হলেই চারদিকটা খয়েরি রঙের ভিতর ডুবে থাকে। পিঁড়ির মুখটা তাই এমন বিদঘুটে লাগছে।

"কেন মানে? নেহাত তোমার কাছে ইংরেজিটা পড়তাম। দাদা বললেও শিক্ষাগুরু তো, তাই কান ধরে প্যাঁদাতে পারছি না। তোমায় কে বলেছিল হিরোগিরি করতে? পঞ্চাশ হাজার টাকা কোনওদিন একসঙ্গে চোখে দেখেছ যে, অত টাকা কমিট করে বসে আছ? আর তোমার ওই গজা পিসটাও খুব ক্যালানে। মাল খেয়ে বন্ধু কী বলল ব্যস, সেটা ধরে নিয়ে সকলে মিলে বাটি পেতে বসে গেল। মাইরি, এমন কাণ্ড করো না!"

আমি কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমারই যে ভুল তা কী আর জানি না? সারাদিন আজ খুব খাটুনি গিয়েছে। বেশকিছু অফিসে মাল সাপ্লাই করার ছিল। তার মধ্যে একটা অফিসে দেড় হাজার প্লাস্টিকের স্যাকের উপর ওদের নাম প্রিন্ট করিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। এর জন্য অবশ্য ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল। কিন্তু অফিসটা চারতলায়। ভাগ-ভাগ করে কাঁধে নিয়ে বস্তা তুলতে জান কয়লা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী আর করব, আমাদের মতো মানুষদের জান ইনস্ট্যান্ট কয়লার ডিপো। শুধু গচ্চা দিয়ে যাও। তবে হ্যাঁ, আজ কালেকশনও হয়েছে। প্রায় হাজার সাতেক টাকার মতো। কিন্তু এর বেশির ভাগটাই বাবাকে দিয়ে আসতে হবে। গতমাসে টাকা কম দিয়েছিলাম।

আসলে কলেজ পাশ করার পরপরই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, প্রায় বছর দুয়েক আমার সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল! সেসময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আক্রার কাছে গঙ্গার ধারে ঝিনুকবাঁকে থাকতাম আমরা। ঘটনার পর সারাদিন বাড়িতেই বসে থাকতাম একা। কেমন যেন একটা থতমত ভাব এসে গিয়েছিল আমার। কেমন যেন বিশ্বাসই করতাম না যে, বোবো আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে ওর জীবন থেকে। খেতে পারতাম না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতাম। আবার কোনওদিন ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বসে থাকতাম একা। কারও সঙ্গে কথা বলতাম না। সারাদিন আমাদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে নিজেকে আটকে রাখতাম। মনে হত কেউ আমায় টানছে, খুব করে টানছে মাটির ভিতর থেকে। পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে কেউ আমায় গলিয়ে মারতে চাইছে রোজ!

"কী গো সমদা? এমন ভেবলে গেলে কেন তুমি?" পিঁড়ি খোঁচাল আমায়।

"নাহ, এই ভাবছি আর কী! আসলে জানিস তো, গজার টাকাটা খুব দরকার। মানে, জানিসই তো ওর বাড়ির অবস্থা। মা না থাকাটা খুব ভাইটাল রে জীবনে। খুব কষ্টেরও। তাই... দেখি যদি জোগাড় করতে পারি!"

"তোমার নিজেরও কিন্তু বোন আছে। এটা মাথায় রেখো। তার বিয়ে আছে, তোমার বাবার চিকিৎসা আছে। আরও নানা বিপদ-আপদ আছে। গজাদাকে তো কখনও তোমায় হেল্প করতে দেখি না।"

"বড্ড বাজে বকছিস!" আমি এবার ধমক দিলাম, "গজা চেষ্টা করে, কিন্তু কী করবে বল। ওর তো আর্থিক অবস্থা খারাপ।"

"আর তোমার?" পিঁড়ি বলল, "তোমার তো খুব ভাল, বলো? অত বড় ফ্ল্যাটে থাক বলেই কি তুমি বড়লোক? তোমার তো বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তনের গল্প। তাই বলছি, না বলে দাও স্টেট।"

"না চেষ্টা করে ছাড়াটা..." আমি কথা শেষ না করে দেখলাম

আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে গিয়েছি।

পিঁড়ি মাথা নাড়ল, "তোমার শালা আর গুডবয় হওয়াটা গেল না। পরদিন আমিও তোমায় বিয়ার খাইয়ে একলাখ টাকার বুকিং করিয়ে রাখব। বাই দ্য ওয়ে, গজাদা এরপর আবার নিজের বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক না করে।"

আমি হাসলাম, "পাগল তুই? বিয়ে আর আমি! খেপেছিস?"

পিঁড়ি হাসতে গিয়েও কেমন যেন থমকে গেল। বলল, "কেন, তুমি কোনওদিন বিয়ে করবে না? বত্রিশ তো পেরিয়ে যাচ্ছে?"

"আরে খাওয়াব কী?" আমি হেসে বললাম, "মুড়ি-বাতাসার বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না যে।"

"তুমি এখনও সেই মেয়েটাকে ভুলতে পারনি না?"

আমি চুপ রইলাম। কী উত্তর দেব? সবকিছুর কি আর উত্তর হয়?

"তুমি মাইরি উনিশশো দশ সালের মডেল। এখনও 'প্রেম একটাই হয়' থিয়োরি নিয়ে পড়ে আছ। আরে বাবা, পৃথিবী কোথায় এগিয়ে গিয়েছে। লোকে সকাল-বিকেল গার্লফ্রেন্ড বদলাচ্ছে। এক-একজন তো একসঙ্গে তিন-চারটে প্রেম করছে! আর তুমি? তোমার পাশের ফ্ল্যাটের বউদির দু'টো বোমা তোমার দিকে বাড়িয়ে রেখেছে, কিন্তু তুমি শালা ড্যাম্প দেশলাই, কোথায় সলতেয় আগুন দেবে, না একটা মেয়ের জন্য সারা পৃথিবীর মেয়েদের উপর অভিমান করে বসে আছ? মানুষ হবে না তুমি?" পিঁড়ি আমায় মানুষ না করতে পারার ব্যর্থতায় মাথা নাড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "উপরে আসবি?"

"না আজ আর যাব না। মা কিছু জিনিস কিনতে দিয়েছে, দেরি হলেই তুবড়ি ছোটাবে। আমি কাটি। তুমিও যাও, ফ্রেশ হয়ে নাও। আর আমার কথাগুলো একটু ভেব, কেমন?"

আবছায়ার ভিতরে ডুব দিয়ে চলে গেল পিঁড়ি। ছেলেটা একটু এমন কথা বলে বটে কিন্তু আমায় ভালবাসে খুব। আমি বুঝি ভালবাসার জোরই আলাদা। ভালবাসার মানুষকে সবকিছু বলা যায়।

সবকিছু বলা যায়? আমার মনের ভিতরে কেমনভাবে যেন একটা স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঢুকে গেল। আমি তো বলেছিলাম, "দু' বছর সময় দে আমায়, আমি তার ভিতর কিছু একটা করে নেব।"

বোবো তাকিয়েছিল আমার দিকে। এ যেন অন্য-কোনও বোবো। যেন অন্যগ্রহের মেয়ে। আমার চেনা সেই মেয়েটাই নয়! ও বলেছিল, "না, তুই চলে যা, চলে যা একদম। কোনওদিন আমায় তোর মুখ দেখাবি না। একদম দেখাবি না, বুঝলি?"

আমি দেখাইনি, আমার এই মুখ নিয়ে আমি আর-কোনওদিন যাইনি ওর সামনে।

এইচ এস-এ একবছর ড্রপ দিয়েছিলাম আমি। পড়াশোনার বদলে তখন ফুটবল আর গান নিয়ে মেতে থাকতাম খুব। তাই টেস্টের আগে বুঝতে পারি যে, স্বয়ং ঈশ্বরও আমায় বাঁচাতে পারবে না। বাবা আপত্তি করেছিল আমার ডিসিশনের। কিন্তু বাবা তো আর পরীক্ষা দেবে না। তাই আমি নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় ছিলাম।

পরেরবার যে খুব ভাল হয়েছিল রেজাল্ট তা নয়, তবে পাশ করেছিলাম। সায়েন্স ছিল আমার। টেনেটুনে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে উতরে গেলেও সায়েন্সের কোনও সাবজেক্টেই আমি অনার্স পাইনি। আর সত্যি বলতে কী, আমি যেন কিছুটা বেঁচেও গিয়েছিলাম। এইচ এস-এই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওই বার্লোস ল, অ্যাভোগাড্রো নম্বর, এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ, এই সবটাই আমার কাছে ট্যান থিটা। তাই আমি সরাসরি ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। ইংরেজিতে আমার ভাল নম্বর ছিল তাই এই অনার্সটা আমি ভাল কলেজেই পেয়েছিলাম। আক্রা থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদা নেমে হেঁটে আমি কলেজে যেতাম।

প্রথমদিন কলেজে যাওয়ার সময় বাবা বলেছিল, "দেখিস, আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সময় নষ্ট করিস না। জানবি, সময় নষ্ট করা মানে জীবন নষ্ট করা।"

প্রথমদিন কলেজ যাওয়ার সময় আমি গোটা ট্রেন মনে-মনে এটাই জপ করেছিলাম। শিয়ালদায় নেমে হেঁটে যেতে-যেতে ঠিক করেছিলাম, আর কিছুতেই এদিক-ওদিক মন দেব না। না খেলাধুলো, না গান বাজনা, না প্রেম-প্রীতি। আমার বাকি জীবনটাই হবে পড়াশোনার। কলেজের অত বড় গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় আমার বেশ মনে জোর এসেছিল একটা। মনে হয়েছিল আমি ঠিক পারব। বড় হলঘরের মতো ক্লাসে ঢুকে শেষ বেঞ্চে চলে গিয়েছিলাম। আমি কারও দিকে প্রায় না তাকিয়ে একটা খাতা খুলে আঁকিবুকি কাটছিলাম নিজের মনে। গুঞ্জন বাড়ছিল ক্লাসে। তবে পাত্তা দিচ্ছিলাম না আমি। ভুলভাল দাগই কেটে যাচ্ছিলাম। তারপর আচমকা একটা গম্ভীর গলার স্বর শুনে বুঝেছিলাম ইউনিয়ন থেকে ছেলেপিলে এসে কিছু বলছে। আমি খাতা রেখে মুখ তুলে তাকিয়েছিলাম সামনে।

ঠিক সেই সময়ই আমার সামনে থেকে যেন দু' ভাগ হয়ে সরে গিয়েছিল লোহিত সাগর। আর সে ফাঁকের শেষ প্রান্তে আমি দেখেছিলাম একটা নীল চুড়িদার। তার সাদা ওড়নাটা সামান্য উড়ছে। আর সেটা সামলাতে-সামলাতে সে ওড়নার অধীশ্বরী কথা বলছে ইউনিয়নের একটা ছেলের সঙ্গে। কে কথা বলছে ও? কোথা থেকে নেমে এল এই মেয়ে? এতদিন কোথায় ছিল? দিকভ্রান্ত নাবিক যেন খুঁজে পেয়েছিল তার তটরেখা! যেন অন্ধকার পেয়েছিল তার প্রথম কিরণস্পর্শ! যেন হারিয়ে যাওয়া রুবিগুলি খুঁজে পেয়েছিল এক ছোট্ট বালক! আমি বুঝেছিলাম, আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞারই মৃত্যু ঘটল। বুঝেছিলাম, আমার সামনে প্রচুর খাটুনি আর কষ্টের দিন আসছে।

ফ্ল্যাটের ভিতরে আলো আছে বেশ। বাইরের ড্রাইভওয়ের দু'দিকে বাহারি আলো ঝুলিয়ে সুন্দর করে সাজানো রয়েছে জায়গাটা। ড্রাইভওয়ের একদম শেষে দারোয়ানদের ঘর। আগে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভয় পেত। কিন্তু এখন আমার ট্যাঁকের কন্ডিশন বুঝতে পেরেই আর তেমন ভয়-টয় পায় না।

মিশিরজির ডিউটি নেই এখন। গেটে বলবন্ত আছে। আমি লিফটের কাছে যেতেই মিশিরজি বলল, "আরে সমবাবু, ম্যাডাম আপনাকে খুঁজতে ছিল, খুব আর্জেন্ট দরকার।"

"ম্যাডাম?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিশিরজি হাসল, "হ্যাঁ, কুসুম ম্যাডাম। আপ জরা উনকা ঘর হোকে যাইয়ে গা, নহি তো বহত ডাঁটেগি মুঝে।"

আমি মাথা নেড়ে লিফটে উঠে গেলাম। কুসি বউদি ডেকেছে যখন তখন নির্ঘাত কোনও কাজ আছে। আমার অস্বস্তি হল। সকালে যখন চায়ের ধান্দায় যাই, তখন দাদা থাকে বাড়িতে। বউদির তখন কী অদ্ভুত শান্ত ব্যবহার! কিন্তু আমাকে একা পেলেই ডক্টর জেকিলটি বেরিয়ে আসে।

লিফটে উঠতে-উঠতে আমার মুখটা বিস্বাদ লাগল।

আমার ফ্ল্যাটের পাশেই কুসি বউদির ফ্ল্যাট। বউদির কোনও ইস্যু নেই। বয়স প্রায় আটত্রিশ। দাদারও পঁয়তাল্লিশের মতো। কাজের লোকরা রান্না ও অন্যান্য কাজ করে দিয়ে চলে যায়। সন্ধের পর থেকে রাত ন'টা অবধি বউদি একাই থাকে। আর এই সময়টা আমি পারতপক্ষে যাই না ওই ফ্ল্যাটে।

লিফট থেকে বউদির ফ্ল্যাটের দরজা অবধি করিডরটা শুনশান। আমার একবার মনে হল ফ্ল্যাটে গিয়ে ব্যাগটা রেখে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। কিন্তু তারপরই ভাবলাম ব্যাগটা সঙ্গে থাকলে দ্রুত নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। বউদিদের ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়ে আমি হাত দিয়ে মাথার চুলটা আরও একটু এলোমেলো করে নিলাম। চোখে-মুখে আরও ক্লান্তির ভাব আনলাম।

খুট করে দরজাটা খুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর একটা হাওয়া এসে ঝাপটা মারল আমায়। স্লিভলেস নাইটি পরে দাঁড়িয়ে আছে বউদি। দেখে বুঝলাম সদ্য স্নান করেছে। আর পারফিউমের গন্ধে টাল খেয়ে আছে গোটা ফ্ল্যাট।

"এত দেরি করলে! আমি কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্য," বউদি আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন আমি বলে গিয়েছিলাম কখন আসব।

"কিছু দরকার ছিল বউদি? আসলে সারাদিন পর এসেছি তো, খুব ক্লান্ত লাগছে!"

বউদি দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ রেখে বলল, "তাই? তুমি আমার এখানেই স্নান করে নাও। তোমার জন্য কিছু খাবার করে দিচ্ছি।"

"না, না," আমি বললাম, "তুমি বলো না কী দরকার।"

"কিচেনের সিএফএল-টা ফিউজ হয়ে গিয়েছে। আমি তো লাগাতে পারব না। তুমি পারবে লাগাতে?" কথাটা বলে ঠোঁট টিপে হাসল বউদি।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তুমি সিএফএল-টা আনো, আমি টুল নিয়ে আসছি।"

"বারবার লাইট কেটে যায় কেন বলো তো?" বউদি লাইটটা নিয়ে এসে বলল।

তুমি সিএফএল-টা আনো, আমি টুল নিয়ে আসছি।"

আমি জুতোর র‍্যাকের পাশ থেকে টুলটা এনে কিচেনের ভিতরে দাঁড়িয়ে বললাম, "কে জানে!"

"তুমি তো কিছুই জান না। তুমিও কাটা বাল্‌ব্‌ একটা," বউদি বাল্‌ব্‌টা দিতে গিয়ে আলতো করে হাত ছুঁল আমার।

আমি মনে-মনে ঘাবড়ে গেলেও মুখের হাসি ডিসপ্লেস হতে দিলাম না। বাল্বটা ফিট করে টুল থেকে নীচে নেমে বললাম, "হয়ে গিয়েছে। আমি তবে যাই?"

"চলে যাবে?" বউদি এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার কাছে, "কেন যাবে? আমাকে তোমার খারাপ লাগে?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিলাম।

বউদি আমার হাত ধরে বলল, "তুমি আমায় খারাপ ভাব, তাই না?"

"না, না, মানে, আমি..." আমার সেই ড্যাম্প-লাগা অন্ধকার ঘরটায় আমি কথা খুঁজতে লাগলাম।

বউদি আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমার যে তোমাকে খুব ভাল লাগে সম, আমি কী করব?"

"আমিই বা কী করব বউদি! আমার যে এসব ভাল লাগে না। আমার নানা অশান্তি জীবনে। আমি যে এসব ভাবতেই পারি না!"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে তুমি এসব বলছ?" বউদি আমার জামার বোতামে হাত রাখল।

"আমি বউদি একটা মেয়েকে ভালবাসি। তাকে ছাড়া...." আমার গলা বুজে এল আচমকা।

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সরে গেল দ্রুত। বলল, "যাও তুমি। কাজ হয়ে গিয়েছে যখন, যাও।"

করিডরে বেরিয়ে শুনলাম আমার পিছনে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আমার প্রথমেই মনে হল, কাল সকাল থেকে চা-টা বোধ হয় ভোগে গেল। তারপরই খারাপ লাগল খুব, টাকা-পয়সার অভাব মানুষকে মাঝে-মধ্যে খুব ছোট করে দেয়। একজন আমায় প্রেম নিবেদন করল আর আমি ভাবছি চা খাওয়া গেল আমার! ছিঃ।

"এই যে, পেয়েছি।"

আচমকা গলার স্বরে আমি কেঁপে উঠলাম। দেখলাম আমার থেকে দশহাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দাদা, মানে কুসি বউদির স্বামী।

দাদা বলল, "কী ব্যাপার? আমি নেই, আর আমার ফ্ল্যাটে কী করা হচ্ছিল?"

"অ্যাঁ?" আমার হাত পা ঘেমে উঠল নিমেষে। সর্বনাশ, দাদা কি বুঝতে পেরেছে সব?

দাদা পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "কী ভেবেছ কী? তুমি না বললে আমি জানতে পারব না? আমায় তুমি বোকা ভাব সমন্বয়?"

৩

শীত চলে যাওয়ার পরের এই সময়টা খুব ভয়ংকর। এখনকার দিনে বসন্ত বলে কোনও কাল আর নেই। আমি মাঝে-মধ্যে ভাবি এই সময়ে রবিঠাকুর জন্মালে কি অত বসন্তের গান লিখতে পারতেন? এখনকার বাচ্চারা তো স্প্রিং বলে কিছু হয় সেটা জানেই না। তাই কি বাংলায় এখন প্রেমের গল্প-কবিতা লেখা কমে যাচ্ছে? আবহাওয়া যে কীভাবে শিল্প-সংস্কৃতির সর্বনাশ করে তা যদি কেউ বুঝত!

স্কুলজীবন থেকেই খুব বই পড়তাম আমি। মাসে দু'বার ট্রেন ধরে চলে আসতাম কলেজ স্ট্রিট। প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন কিনতাম। তারপর ওয়েলিংটন থেকে কিনতাম পুরনো গানের রেকর্ড। আমার বাবার কাছে একটা গ্রামোফোন আছে। সেখানেই গান শুনতাম। ন্যাট কিং কোল, প্যাট বুন, জন ডেনভার। আমার বাড়িতে সবসময় ভেসে থাকত গান। ফুটবলের পাশাপাশি সেসময় থেকেই সেকেন্ড হ্যান্ড গিটার কিনে নিজে-নিজে বাজানোর চেষ্টার সেই শুরু। তারপর এর থেকে ওর থেকে সামান্য শিখে আর প্র্যাকটিসে ভর করে গিটারটা আমি মোটামুটি বাজাতে শিখে যাই। তখন সবে এইচ এস শেষ হয়েছে আমার। বাবা একদিন ছোট্ট একটা ওয়াকম্যান কিনে আনল আমার জন্য। আর আনল দু'টো ক্যাসেট। দেখলাম কভারে চারজনের ছবি। কেউ বসে আছে, কেউ আছে দাঁড়িয়ে। আর তলায় লেখা বিটল্‌স। সেই শুরু। তারপর থেকে সবাই আমায় ছেড়ে চলে গেলেও বিটল্‌স ছেড়ে যায়নি।

আজ এই খুলি ফুটো করে দেওয়া গরমেও কেন জানি না আমার বসন্তের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সকালের রোদে আমার ঘরের মেঝেতে খুনসুটি করা জন, পল, জর্জ আর রিঙ্গোকে। মনে পড়ল একসময় কলকাতায় বসন্তকে বোঝা যেত বেশ। মনে পড়ল এমনই এক বসন্তের বিকেলে কলেজের সামনের মাঠে বসে আমি গেয়েছিলাম...

'Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right...'
(অ্যাবে রোড, দ্য বিটল্‌স)

সাত-আটজনের সঙ্গে সেদিন বোবোও বসেছিল সামনে। আমি চোখ বন্ধ করে গাইতে-গাইতে শেষ মুহূর্তে চোখ খুলে দেখেছিলাম বোবো অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সে ছিল এক জীবনের দৃষ্টি! সেদিন কলেজ স্কোয়্যার থেকে হাওয়া বইছিল, একটা অদ্ভুত নীল আকাশ পাতা ছিল আমাদের মাথার ওপর। বসন্ত বলে একটা ঋতু তার সমস্ত পেখম মেলে ধরেছিল শহরের মাথায়! বোবোর সঙ্গে যখন থাকতাম তখন সত্যিকারের বসন্তের বিকেল আসত কলকাতায়। বোবো আমায় সরিয়ে দেওয়ার পর তেমন পেখম-মেলা ঋতু আর আসেনি কোনওদিন।

মোবাইলটা বের করে দেখলাম আমি। প্রায় চারটে বাজে। এখান থেকে কুইন সিনেমা যেতে হেঁটে আরও কুড়ি মিনিট মতো লাগবে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ি যেতে আরও আধঘণ্টা। রোদটা আজ বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে গলা। কাছাকাছি একটাও দোকান খোলা নেই। মফস্‌সলের এই একটা ব্যাপার। দুপুরে সবাই

দোকানপাট বন্ধ করে বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দেয়। বিকেল পাঁচটার আগে কেউই প্রায় দোকান খুলতে চায় না। আমার মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল। আমার ভাগ্য লেখার সময় কি কনস্টিপেশনে ভুগছিলেন বিধাতা পুরুষ? নাকি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল? এমন ভুলভাল কপাল শালা পৃথিবীতে থাকতে পারে কারও? কী মরতে যে দাদার কথা শুনে এখানে এসেছিলাম।

কুসি বউদির ঘর থেকে বেরিয়ে সেদিন দাদা এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছিল যে, আমার তো হার্ট ফেল হওয়ার অবস্থা! মানুষটা আমায় এত বিশ্বাস করে, আর সেখানে তার বউ আমায় প্রেম নিবেদন করছে জানলে, নিশ্চয়ই ভাববে আমার উস্কানি আছে এতে। আমি কী বলব বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

দাদা বলেছিল, "কী ভেবেছ? তুমি না বললে আমি জানতে পারব না? আমায় তুমি বোকা ভাব সমন্বয়?"

"আ-আমি? মানে.. সত্যি বলছি..." আমি মনের সেই স্যাঁতস্যাঁতে আর অন্ধকার ঘরটায় কালো বেড়াল ধরার চেষ্টা করছিলাম।

"শেষ পর্যন্ত পিঁড়ির থেকে জানতে হল আমায়?"

"পিঁড়ি?" আমি অবাক হয়েছিলাম এবার।

"তোমার যে ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না, আমায় বলোনি কেন? আমাদের বাড়িতে তো আসো তুমি, তা আমায় বললে কি তোমার মান খোয়া যেত?"

আমার দুর্বল প্রাণ-পাখি এসে আবার ফুস করে সেঁদিয়েছিল আমার শরীরে। আমি হেসে বলেছিলাম, "না দাদা, আপনি কত ব্যস্ত থাকেন! শুধু-মুদু এসব বলে আপনাকে বিব্রত করা কেন?"

"আরে ব্যস্ত তো নিজের জন্য থাকি। সবাই-ই থাকে। তাতে কী হল! আমায় বলতেই পারতে। তুমি তো জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার, তা মোটামুটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লাই করতে পারবে?"

"বিল্ডিং মেটেরিয়াল মানে? ইট-বালি এসব?"

দাদা হেসে বলেছিল, "না রে বাবা, তা নয়। তবে খুচখাচ জিনিস। সাউথল্যান্ড রিয়েলটর্স আমাদের ফার্মের ক্লায়েন্ট। আমরা ওদের অডিট দেখি। শুনেছি ওদের সাইটে কিছু খুচখাচ সাপ্লাইয়ের দরকার। তুমি ওদের সাইট ইনচার্জের কাছে যেয়ো। নাম বিকাশ সেনাপতি। বোলো যে খবর পেয়ে এসেছ। ও ঠিক তোমায় হেল্প করবে। দেখো, অত বড় প্রজেক্ট, বাল্ক একটা অর্ডার পেলেই তোমার পুষিয়ে যাবে। ওই কমপ্লেক্সটার নাম 'আর্কটিক ভিলেজ।' কাল সকালে আমার কাছে এসো, আমি অ্যাড্রেসটা লিখে রাখব। কেমন? আর সেখানে কিছু না হলে বলো, আমি নিজে রেফারেন্স দিয়ে অন্য জায়গায় পাঠাব তোমায়।"

"কিন্তু এমন হুট করে গেলে আমায় ওরা সুযোগ দেবে কেন?"

"আরে হুট করে মানে? তুমি যাবে, নিজের কোম্পানিকে ইন্ট্রোডিউস করবে। এভাবেই তো হয়। অত লজ্জা পেলে হবে?" দাদা আমায় সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

"থ্যাঙ্ক ইউ দাদা।" আমি আর কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। দাদা আমায় হেল্প করল কি? কোনও রেফারেন্স লেটার দিলে ওই বিকাশ লোকটা আমায় তাও তো একটু পাত্তা দিত! কিন্তু এটা বলতে পারিনি আমি। কুসি বউদি আমার ভিতরে কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।

"ওসব বাদ দাও। আর যেন বাইরে থেকে তোমার কথা আমায় জানতে না হয়, কেমন?" দাদা আর না দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ফ্ল্যাটে।

পরদিন সকালে দাদার কাছে গিয়ে অ্যাড্রেসটা আনতে খুব লজ্জা করছিল আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না, কিন্তু তারপর না গিয়েও পারিনি। হয়তো এমন হুট করে গেলে ওই সাউথল্যান্ড রিয়েলটর্স তাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু চেষ্টাটা তো করতেই হবে। এমন করে এ অফিস ও অফিস করে কতদিন চলবে আমার? আমার যে সত্যি টাকার দরকার। নিজের জন্য, বাড়ির জন্য আর গজার জন্যও। পঞ্চাশহাজার টাকা না দিতে পারি, অন্তত পনেরো-বিশহাজার টাকাও যদি দিতে পারতাম তো ভাল হত।

তাই সাত-পাঁচ ভেবে, লজ্জার মাথা খেয়ে আমি দাদার কাছে গিয়েছিলাম। অ্যাড্রেসটা নিয়ে আমি আর দাঁড়াতে চাইনি। কিন্তু চলে আসতে যাব ঠিক সেই সময় বউদি নিজেই চা আর স্যান্ডউইচ এগিয়ে দিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম বউদির দিকে।

বউদি বলেছিল, "কী হল, আমার মুখে তো খাবার রাখা নেই, আছে টেব্‌লে। আমার দিকে না তাকিয়ে ওটা খাও।"

আমি, চিরকালের টিউব লাইট, কী বলব বুঝতে না পেরে দপদপ করছিলাম।

বউদি বলেছিল, "কী হল, কাল রাতের খাওয়া হজম হয়নি, নাকি বেশি খাওয়া হয়েছিল বলে আজ খিদে নেই?"

আমি স্যান্ডউইচ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম আমার ফ্ল্যাটে। দরজা বন্ধ করতে এসে বউদি আলতো গলায় বলেছিল, "আমার অফার কিন্তু এখনও জ্যান্ত আছে। জানবে মুখ দিয়ে কিন্তু আমি শুধু কথাই বলি না..."

ছোট-ছোট ধারালো ফোটন এসে গেঁথে যাচ্ছে আমার শরীরে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। আমার পা-ও চলছে না। কিন্তু একটা অটোও নেই যে উঠব। রাস্তার দু'পাশে ভাঙা-ভাঙা ছায়া। তারাও গরমের চোটে কেমন যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে। দূরের রাস্তার শেষে কাঁপা-কাঁপা ধোঁয়া উড়ছে। এটা কি সত্যিই বসন্ত? নাকি গ্রীষ্ম এগিয়ে এল?

হাঁটতে আমার কখনওই কষ্ট হয় না। বরং পয়সা বাঁচাতে-বাঁচাতে আমি একজন হন্টনবীর হয়ে উঠেছি। ওসব কোমর বাঁকানো ওয়াকিং রেস নয়, সোজাসাপটা হাঁটায় আমি অলিম্পিকে গোল্ড না পেলেও একপিস ব্রোঞ্জ আনতেই পারি।

সেই আমারও আজ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। বয়স বাড়ছে কি আমার? মাত্র বত্রিশেই কি ঘুণ ধরতে শুরু করল হাড়ে? মেজাজটা বিগড়ে গেল আরও। বিকাশ সেনাপতি মালটাকে বাইরে পেলে আচ্ছা করে প্যাঁদাতাম। এত ভুলভাল লোক আমি দেখিনি। প্রথমদিন থেকে আমায় ঘোরাচ্ছে! প্রথমদিন ওদের সাইটে গিয়ে চিঠি আর আমার কোম্পানির কার্ড দেওয়াতে বিকাশ বলেছিল, "কে আপনি? 'চক্রবর্তী সাপ্লায়ার্স'? করেনটা কী? কোত্থেকে আসেন আপনারা?"

আমি বিনীতভাবে দাদার নাম নিয়ে বলেছিলাম, "উনি আমায় পাঠালেন। কলকাতায় আপনাদের অফিসে ওঁর কোম্পানি অডিট দেখে। বললেন এমন অনেককিছু আছে যা আপনারা সরাসরি নেন এখান থেকে, তাই আমি এলাম। যদি একটা সুযোগ দেন!"

বিকাশ সেনাপতি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, "আজ তো হবে না, এক সপ্তাহ পরে আসুন। দেখি কী করতে পারি!"

এক সপ্তাহ কেন, দু'সপ্তাহে আমি চারবার গিয়েছি। কিন্তু ব্যাটা কিচ্ছু করতে পারেনি। শুধু বলে, ওর নাকি বেজায় কাজ। খুব ব্যস্ত। বলে, কেন আমি এসে ওর মাথা খাচ্ছি! আমি তাও ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, যে-কোনওরকম অর্ডার সাপ্লাই আমি করতে পারি।

তাতে বিকাশ বলেছিল, "যে-কোনও রকম?"

"হ্যাঁ, যে-কোনও রকম।"

"নাকছাবির বন্দোবস্ত করতে পারেন আমার জন্য? একার জীবন আমার, শরীরে ফুয়েল দরকার, পারেন নাকি এটা?" বিকাশ ওর লম্বা মুখে ঝোলাগুড়ের মতো হাসি ঝুলিয়ে বলেছিল।

আমি কিছু বলতে পারিনি। লজ্জায় অপমানে আমার সারা শরীরে রক্তের পরিমাণ বোধহয় লিটার দেড়েক বেড়ে গিয়েছিল!

বিকাশ বলেছিল, "ওসব 'সব পারি' বলবেন না। যান, নেক্সট উইকে আসবেন। উপর মহল থেকে রেকমেন্ডেশন আনলেই হয় না। তারও একটা উপর মহল আছে। সেখানে আমায় জবাব দিতে হয়। অ্যাকাউন্টসের মামদো ভূতদের আমি চিনি না। পরের সপ্তাহের বুধবার আসবেন। দেখি কী করতে পারি!"

আজ সেই বুধবার। তবে না, আজও কিছু করতে পারিনি। বিকাশের সঙ্গে দেখা করতেই ও খেঁকিয়ে উঠেছিল, "আরে মশাই

আপনি আমার চাকরিটা খাবেন নাকি? আজ ম্যাডাম আছেন উপরের অফিসে। সামনের গেট দিয়ে ঢুকেছেন নাকি?"

"না আমি তো পিছনের গেট দিয়ে এলাম। ওটাই আমার শর্টকাট হয়," আমি থতমত খেয়ে বলেছিলাম।

"তো ওটা দিয়েই কাটুন। আপনার কথা বলতে গিয়ে আমায় কী ঝাড়টাই না খেতে হল! ওসব সাপ্লাই-ফাপ্লাই করতে হবে না আপনাকে। ফুটুন তো..."

আমার জেদ ধরে গিয়েছিল, "তবে আপনি আমায় ডেকে পাঠালেন কেন?"

বিকাশ তেজের সঙ্গে বলেছিল, "আমি ভাল লোক তাই। তাই আমায় গান্ডু পেয়ে রোজ এসে আমার মাথায় উঠে নাচছেন। এখন ফুটুন। ম্যাডাম নেমে এসে আপনাকে দেখলে আমায় লাথি মেরে বের করবেন। এখন কাটুন।"

আমার মনে হচ্ছিল মালটাকে অ্যায়সা ধোলাই দিই, যাতে বেলচা দিয়ে তুলতে হয়। কিন্তু সব মনে হওয়াগুলোকে কি আর আমরা বাস্তব রূপ দিতে পারি?

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছি আমি। এখানে পরিস্থিতি এমন যে, দাদাকেও বলতে পারব না। কারণ বিকাশ যে এই রেকমেন্ডেশনকে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে আছে আমার। কী করব বুঝতেই পারছি না।

আজ আর ফ্ল্যাটে ফিরব না। বাড়িতে বাবা একবার দেখা করতে বলেছে। জানি না কী দরকার। তবে বলেছে যখন, তখন দেখা তো করতেই হবে। আজ বাড়িতে থেকে কাল ফিরে যাব কলকাতায়। বেশ কয়েকটা অফিসে লেখার প্যাড, পেনসিল আর ট্রেসিং পেপার দিতে হবে। আমি জোরে পা চালালাম। সামনেই কুইন সিনেমার মোড়। সেখানে কোনও দোকান খোলা থাকলে একটা ছোট জলের বোতল কিনতে হবে। আমার শরীর আর দিচ্ছে না।

প্যান্টের পকেটে ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। এখন আবার কে? ফোনটা বের করলাম আমি। কোনও অফিস থেকে কি? ও হরি! স্ক্রিনে নামটা দেখে দমে গেল মনটা। অফিস থেকেই বটে। গজা যেখানে চাকরি করে সেই অফিস থেকে ফোন করেছে। গজার কোনও মোবাইল ফোন নেই। বলে, "অত বিলাসিতা করার টাকা নেই রে। ওর জন্য যে-টাকা দিতে হবে মাসে তাতে মায়ের চারটে ক্যাপসুল হয়ে যাবে।"

সময়-সুযোগ পেলে ও অফিসের ফোন থেকে আমায় দরকার মতো ফোন করে। আজ ওর ফোনটা পেয়েই মনটা দমে গেল। সেই টাকার কথা বলবে নাকি? ওঃ, কী কুক্ষণেই যে বিয়ার খেয়েছিলাম! কী দরকার ছিল আমার ওসব খাওয়ার? কাকের পেটে কি কাঁকরোল সহ্য হয়?

"হ্যালো?" মনে হল কেউ যেন আমার জিভে এক কুইন্টাল ওজন চাপিয়ে দিয়েছে।

"সম?" গজার গলায় অন্যদিনের মতো গুরুদত্ত নেই। বরং একটা দেবানন্দের ছায়া শুনতে পাচ্ছি যেন!

বললাম, "বল।"

"কাল আমাদের অফিসে আসবি একবার। খুব দরকার। এখানে বেশকিছু লেবেল ছাপাতে হবে। আর স্টিকার পেস্টিংয়ের কাজ আছে। খুব দ্রুত লাগবে। কেউ করে দিতে পারছে না। তুই পারবি আমি বলেছি। কাল চলে আসিস কেমন?"

ক্যামাক স্ট্রিটে গজার অফিস, সেখানে টুকটাক অফিশিয়াল কাজকম্ম করে ও। কিন্তু আমি ওকে কোনওদিন কাজের ব্যাপারে সাহায্য চাইনি! ও নিজেও কোনওদিন বলেনি। আমি বুঝলাম খুব ঠেকে পড়েছে ওরা। তাই ডাক পড়েছে আমার।

বললাম, "কাল যেতে বারোটা বেজে যাবে। আমি বজবজ থেকে যাব।"

"ঠিক আছে। তবে কালই আসবি কিন্তু। ঝোলাস না। আর শোন, মনে রাখিস, তোকে কিন্তু আমি একটা কাজ দিলাম," গজা আর কিছু না বলে ফোনটা রেখে দিল।

'ঝোলাস না' মানে? 'কাজ দিলাম' মানে? কথাগুলো কট করে কানে লাগল আমার। ও কী বলতে চাইল? ওই টাকার ব্যাপারটার জন্য? মুখটা তেতো হয়ে গেল আমার। তেষ্টাটা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। মনে হল আর কতরকম অপমান সারাজীবন সহ্য করতে হবে আমায়?

কুইন সিনেমার মোড়ের কাছে কয়েকটা দোকান খোলা আছে। যাক। আমার মনে হল দু' হাজার বছর মরুভূমি দিয়ে হাঁটার পর আমি এসে পড়লাম কোনও জলাশয়ের কাছে। একটা পানের দোকান থেকে ছোট নয়, বড় বোতলই কিনলাম। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে জলটা ঢাললাম গলায়। চোখ বুজে এল ক্লান্তিতে। আর ঠিক সেসময়ই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বুজে আসা চোখের ওই অল্প ফাঁক দিয়েই যেন দেখতে পেলাম একটা ম্যাটাডোর সাঁ করে ছুটে গেল! আর কে যেন চিৎকার করল! একটা ধাক্কার শব্দ হল পিছনে আর তারপর জড়ানো একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। জলের বোতলটা সরিয়ে আমি চট করে পিছনে ফিরলাম। দেখলাম রাস্তার পাশে পড়ে আছেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তার পাশেই পড়ে রয়েছে একটা সাইকেল ও তার চালক। ভদ্রলোকের মাথাটা মাটিতে পড়ে আছে আর তাঁর পরনের সাদা পাঞ্জাবিটার গলায় কাছটায় লালের ছিটে। রক্ত! আমি দেখলাম মাথা থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে ওঁর। ভদ্রলোকের চোখ বন্ধ। শরীরটাও নিথর। পাশে পথের উপর পড়ে আছে ওঁর ভাঙা মোবাইল।

জলের বোতলটা কোনওমতে দোকানে রেখে আমি দৌড় দিলাম ওদিকে। কী হল মানুষটার? হেড ইনজুরি হয়েছে। রক্তও বেরোচ্ছে বেশ। ভয়ের কিছু নেই তো?

৪

রিঙ্গো আর পল গিটারের উপর দিয়ে লাফালাফি করছে। জন আর জর্জ শুয়ে আছে পাপোশের উপর। আজ গরম পড়েছে খুব। আমি যে-ঘরটায় শুয়ে থাকি সেটা আমার মামাতো ভাইয়ের বেডরুম হওয়ার কথা ছিল। এই ঘরটায় এসি-ও লাগানো রয়েছে। গরমের সময় এসি-টা চালাতে ইচ্ছে করলেও লোভ সংবরণ করি। ভাবি ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে যা, তাতে বাকি মাসটা হরি-মটর ছাড়া কোনও গতি থাকবে না।

তাই খুব গরম লাগলে আমি বালিশ মাথায় দিয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকি। আজও তেমনই আছি। আমার থেকে দু' হাত দূরে জন আর জর্জ ঘুমোচ্ছে। একদম চিৎ হয়ে এ-ওর গায়ে লেজ তুলে দিয়ে ঘুমচ্ছে। ওদের দেখে আমার খুব মায়া হয়। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমারও যে একটা বিড়াল ছিল ছেলেবেলায়। চুমু। মা নাম দিয়েছিল। চুমু সবসময় ঘুরে বেড়াত আমার সঙ্গে। ছাদে, উঠোনে, বিছানায়, চুমুকে কেউ যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল আমার গায়ে। আমারও ওকে ছাড়া ভাল লাগত না এক মুহূর্ত। কিন্তু এই চুমুই একদিন হঠাৎ কোথায় জানি চলে গিয়েছিল!

কোথায় গেল চুমু? আমি খুব খুঁজেছিলাম। বিষ্ণুদের মাঠ, বঙ্কু বিহারির মন্দির, মাল গুদাম, রেল ইয়ার্ড, গঙ্গার ধার, সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে আমি ফিরে এসেছিলাম বাড়িতে। মনে হয়েছিল আমার শরীরের কোনও অংশ বোধহয় বাদ হয়ে গিয়েছে। রাতে ঘুমের মধ্যে আমি চুমুকে খুঁজতাম।

না কেউ দেখত না আর সেসব। আমার সবকিছুই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল! আমি একা-একা কাঁদতাম খুব। তারপর বাবা একদিন এসে বসল আমার পাশে। "তুই কাঁদছিস কেন? জানবি, এত মায়া ভাল নয়। জীবনে সব করবি কিন্তু এমন করে জড়িয়ে পড়বি না কিছুর সঙ্গে। জানবি সবাই একসময় যায়, সেটা মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কেমন?"

আমি কী বুঝেছিলাম জানি না, কিন্তু বাবার ওই আমার পাশে এসে

বসাটা আমায় কেমন যেন সহজ করেছিল, শান্ত করেছিল। মনে হয়েছিল বাবা যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই ঠিক কথাই বলছে। আমি মনে-মনে ঠিক করেছিলাম পৃথিবীতে আর-কোনও কিছুর উপর কোনওদিন মায়া করব না। ঠিক করেছিলাম সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখব নিজেকে।

পারিনি, সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারিনি। তাই ছুটির এই নির্জন দুপুরগুলোয় আমার মন আজও খারাপ হয়। সেই ছেলেবেলার মতো কান্না পায়। মনে হয়, আবার আমি খুঁজতে বেরোই ওকে। আবার নিয়ে আসি আমার কাছে। কিন্তু না, আমি যাব না। আমি যেতে পারি না। বোবো যে নিজেই বলেছিল আমায় চলে যেতে। বলেছিল, এই মুখ আমি যেন ওকে না দেখাই। চুমুর কথা আমি বলেছিলাম বোবোকে। কিন্তু আজ, বোবোর কথা আমি কাকে বলব?

পাশ ফিরলাম আমি। মোবাইলটা তুলে দেখলাম। তিনটে বাজে প্রায়। আজ রোববার। তাই গড়াচ্ছিলাম। সাড়ে তিনটে নাগাদ পিঁড়ি আসবে। ও আজ আমায় সিনেমা দেখাবে একটা। সিনেমা দেখার আগে অবশ্য ছোট্ট একটা কাজ আছে। বাবার একটা ওষুধ ডোঙারিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে না। সেটার খোঁজ করতে হবে।

বাবাকে এবার দেখে বেশ খারাপ লাগল। আসলে খুব বেশি বাড়ি যাওয়া হয় না আমার। মাসে একবার যেতে পারি বড়জোর। আর এবার তো দেড়মাস পরে গিয়েছিলাম। আর গিয়ে দেখেছিলাম এই দেড়মাসেই বাবা যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে আরও!

"কী হয়েছে তোমার?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাবা হেসেছিল। ক্লান্ত হাসি। বলেছিল, "কিছু না।" বোন বলেছিল, "না রে দাদা, বাড়িতে অশান্তি কম আছে? তার ছাপ বাবার উপর পড়বে না?" "অশান্তি?" আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, "আমি ফোন করলে যে বলিস সব ঠিক আছে? মিথ্যে বলিস?" বাবা বলেছিল, "তুই চুপ করবি টুই?" "কেন চুপ করব?" বোন রেগে গিয়েছিল, "সব সময় তো চুপ করেই আছি। জেঠু, জেঠিমা যা শুরু করেছে! তুই জানিস না দাদা, কী করছে ওরা! গোটা জমিটায় আমাদের যে অংশ, সেটা নাকি ওদের নামে লিখে দিতে হবে। বাবাও দেবে না আর ওরাও নেবে। একদিন তো ওই জমজ দু'টো এসে অকথ্য গালাগালিও করে গিয়েছে।"

বাবা এবার ক্লান্ত গলায় বলেছিল, "কী করি বল তো? কোনও এক বড় কোম্পানি নাকি জমিটা বায়না করে রেখেছে। আমার অংশটা বলছে দু' লাখ টাকায় লিখে দিতে। আমি জানি, ওটার দাম কম করে এখন লাখ দশেক হবেই।"

"তুমি জেঠুকে বলো তা হলে..."

"সেটা তো আর দাদা মানতে চাইছে না। অন্যান্য শরিকদের থেকে দাদা জমি কিনে নিয়েছে সস্তায়। এখন বাকি আছি আমি। তাই আমার উপর..." বাবার গলাটা বুজে এসেছিল হতাশায়।

আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। বোনটা পড়াশোনায় ভাল। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে এখন। বোনের গোটা জীবনটা পড়ে রয়েছে। ওর পড়াশোনার খরচ, বিয়ে সব তো আমাদেরই দিতে হবে। বাবার তো তেমন টাকা-পয়সা নেই। জুট মিল যখন খোলা ছিল আমাদের কোনও অভাব ছিল না। বাবার মাইনেও ভাল ছিল। কিন্তু মায়ের অসুখে প্রচুর টাকা বেরিয়ে যায়। মায়ের মৃত্যুর পরপরই বন্ধ হয়ে যায় মিল। মায়ের মৃত্যু আর চাকরি না থাকা, এই দু'টো ঘটনা পর-পর ঘটায় বাবা ভেঙে পড়েছিল। তখন আমরা আক্রার কাছে ওই ঝিনুকবাঁকে থাকতাম। সেই সময় আমার ঠাকুরদাও মারা যান। বাবা বাড়ির অমতে মাকে বিয়ে করায় ঠাকুরদা বাবাকে বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর জেঠুই আমাদের বলে এই ডোঙারিয়ায় আমাদের নিজেদের বাড়িতে চলে আসতে। এমনকী এই জমিটাও বাবাকে জেঠুই সেসময় পাইয়ে দিয়েছিল। আসলে জেঠু এমন ছিল না তখন। কিন্তু ওই জীবন আর সংগ্রাম দু'জন বর্ধমান থেকে এখানে আসার পরই সব কেমন যেন পালটে গিয়েছে!

তবে এখানে এসেও কোনও লাভ হয়নি। বরং বাবার মনখারাপ যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। তার উপর শেষ ভরসা হিসেবে আমিও তেমনকিছু করতে পারলাম না। ফলে আমাদের সংসারটা হয়ে পড়ল পোড়া রুটির মতো। এখন আমাদের সম্বল বলতে তো শুধু ওই জমিটা। আর সেটাই যদি এভাবে কেড়ে নিতে চায়, তা হলে তো বাবার চিন্তা হওয়ারই কথা।

আমি ছেলে হিসেবে অক্ষম। শত চেষ্টা করেও পারিনি কিছু করতে। আমার আসলে ইচ্ছে ছিল আমাদের জমিটায় একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টেশন করার। আর তার সঙ্গে একটা ওল্ড এজ হোম খুলব। এটা আমার সেই কলেজ জীবনের ইচ্ছে। কিন্তু আমার সাধ আর সাধ্যের মধ্যে অনেক ফারাক। তার উপর আমি এখন জমির রোম্যান্সের বদলে ইকনমিক দিকটা বুঝি। তাই বাবার ইচ্ছে মতো আমিও ঠিক করেছি সময় হলে আর ভাল দাম পেলে বিক্রি করে দেব জমি। তাই বলে দু' লাখ টাকায় তো আর দেওয়া যায় না। কেউ আমায় ঠকাবে আর সেটা আমি মুখ বুজে মেনে নেব কেন?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, "দাঁড়াও, জেঠুকে দেখাচ্ছি মজা। তোমায় একা পেয়ে জুলুমবাজি!"

বাবা হাত ধরে আমায় বসিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "এখন না। আমি ওদের ঠেকিয়ে রেখেছি। যখন আমি পারব না, বলব। তখন তুই আসিস। এসেছিস একদিনের জন্য আর ঝগড়া করিস না।"

আমার মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে জেঠু এমন করে কী করে? কষ্ট হয় না? কী জানি হয়তো হয় না কষ্ট। সবার যে কষ্ট হবে, তার তো মানে নেই। এই বোবোই তো অমন করে ভালবাসার পর আমায় চলে যেতে বলতে তো একবারও দ্বিধা করেনি! কষ্ট হলে কি এমনটা পারত?

এই হয়েছে আমার সমস্যা। আমার সবকিছুই শেষমেশ এসে বোবোতে গিয়ে থামে। এতদিন হল তবু ভুলতে পারলাম না কেন? আশপাশে অনেকেই তো দেখি দ্রুত বান্ধবী পালটায়! তবে? আমি পারি না কেন?

পারি না, আমি পারি না। কারণ বান্ধবী পালটানোই যায়। কিন্তু জীবন! সেটা কি আর পালটে ফেলা যায়! আমি তো বোবোকে বলেছিলাম, "যদি আমায় বিয়ে না করে অন্য-কাউকে বিয়ে করিস, দেখবি আমার কী হয়! জানবি যেদিন তোকে তোর বর প্রথম ছোঁবে, সেটাই হবে আমার মৃত্যুদিন। তোকে ছাড়া আমিও আর কারও হব না কোনওদিন, দেখিস।"

বোবো হেসেছিল খুব। বলেছিল, "নাটক না? খুব নাটক করতে শিখেছিস! আর মিথ্যে বলতে হবে না। আমি বিশ্বাসই করি না।"

আটবছর হয়ে গিয়েছে, আমি আর অন্য-কোনও মেয়ের দিকে তাকাই না। তাকাতেই পারি না। আমি যা বলেছিলাম সেটা যে সত্যি, তা জীবন দিয়েই হয়তো প্রমাণ করতে হবে আমায়।

আমার নিজের ঘরে বসে সারাটা রাত এসবই মনে হয়েছিল। ভাবছিলাম, আমি কি বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছি? কোনও জিনিসকে কি তার প্রাপ্য গুরুত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি? মনে হয়েছিল আমি নিজেই কি নিজেকে বন্দি করে রাখছি খাঁচায়? বোবো কি আদৌ আমার কথা ভাবে? ওর তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা কবে! কী হয়েছে ওর? ছেলে না মেয়ে? নাকি দু'টোই? নানা কাজের ফাঁকে ওর কি আর আমার কথা মনে পড়ে?

আমি মেঝে থেকে উঠে বসলাম। সেদিন বাড়ি থেকে আসার সময় আমি বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম জেঠুর সঙ্গে কথা বলব কি না! বাবা বারণ করেছিল আবার। বলেছিল, দরকার হলে বলবে।

আর আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম যে, জেঠুও আমায় দেখে কথা বলতে চায়নি। ফেরার আগে বোন আমায় ঘরের কোনায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, "এবার একটা বিয়ে কর দাদা। আর কতদিন এভাবে থাকবি?"

আমি হেসে বলেছিলাম, "আমার সঙ্গে এত শত্রুতা কেন তোর?"

বোন ম্লান মুখে বলেছিল, "কে তোকে ছেড়ে গেল তার জন্য গোটা জীবনটাই দিয়ে দিবি নাকি?"

আমি আবার হেসেছিলাম। বলেছিলাম, "আমার যে সব দিতেই হবে সে তো আমি জানি... সব দিতেই হবে..."

আসলে আমি পুরনো দিনের মানুষ। আমি মনে করি, প্রেম একটাই হয়। একবারই হয়। ফরএভার প্রেমে আমার বিশ্বাস অটল। মনে হয় রোল-চাউমিনের মতো প্রেম আমার পক্ষে আর হওয়ার নয়। আমার আজ মনটা এত খারাপ লাগছে কেন কে জানে! মনে হচ্ছে পিঁড়িটা আসছে না কেন এখনও।

ফোনটা তুলে ওর নম্বর ডায়াল করলাম আমি।

"হ্যালো?" দু'বার রিং হতেই পিঁড়ি ধরল।

"কখন আসছিস তুই?"

"কেন গুরু? এই তো এবার বেরোব। আর বোলো না আগেই বেরোতে পারতাম। বাবা এই বুড়ো বয়সে খাটের তলায় ঢুকে কীসব বের করতে গিয়েছে, আর বেরোবার সময় মাথায় গুঁতো খেয়েছে খুব। ভাগ্য ভাল ফাটেনি। আর তারপরই মাইরি আমায় কী গালাগালি করছে। যেন আমি ওই খাট। যাই হোক, বুড়োর মাথায় বরফ ঘষে গুঁতো আর রাগ দু'টোকেই ঠান্ডা করেছি। এবার বেরোচ্ছি। তুমি রেডি হয়ে নাও ততক্ষণে। এসেই বেরিয়ে পড়ব।" পিঁড়ি রেখে দিল ফোনটা।

আমি হাই তুললাম একটা। পিঁড়ির বাবার খুব বড় ব্যবসা আছে। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের। লোকটা ভাল, তবে একটু খিটখিটে। মাথা ফাটলে খুব কেলেঙ্কারি হত। আমার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া ভদ্রলোকের কথা। আমি তো ভেবেছিলাম, গেল বুঝি লোকটার মাথাটা। ম্যাটাডোরে মারলে তো মারাই যেতেন। কিন্তু ম্যাটাডোরকে কাটাতে পারলেও পিছন থেকে আসা সাইকেলটাকে আর এড়াতে পারেননি। আমি রক্ত দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বেশ। আরও দু'জন আর ওঁর ড্রাইভারের সাহায্যে কাছের একটা ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওঁকে। প্রথমে ওরা নিতে চাইছিল না। কিন্তু এই অঞ্চলের ছেলে আমি। কিছু চেনাজানা তো আছেই। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন আঘাতটা তেমনকিছু নয়। হ্যাঁ মাথা ফেটেছে, স্টিচও করতে হবে, কিন্তু সেটাও মারাত্মক কিছু নয়। আসলে ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে তাই শকটা বেশি পেয়েছেন।

মানুষটা কথা বলতে পারছিলেন না। সবকাজ মিটতে প্রায় এক ঘণ্টার মতো লেগেছিল। তারপর আমি আর দাঁড়াইনি। ভদ্রলোক আমায় ধন্যবাদ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু শকের জন্যই বেশি কথা বলতে পারেননি। আমিও গায়ে পড়িনি। দেখলেই বোঝা যায়, পয়সাওলা মানুষ। যে-গাড়িটা চড়ে এসেছেন সেটা সারা জীবনের রোজগার জড়ো করলেও হয়তো কিনতে পারব না। এসব মানুষ দেখলেই কেমন যেন ভয় লাগে আমার। পেটের ভিতরটা গুড়গুড় করে। কেন জানি না আমার বোবোর মায়ের কথা মনে পড়ে। না, মনে পড়ার কোনও কারণ নেই, কিন্তু পড়ে। আসলে এতবছর ওই মেয়েটাকে মনে-মনে বহন করছি তো, তাই হয়তো অবচেতনে আমার সবকিছুর সঙ্গেই ওর একটা যোগ আমি ঠিক খুঁজে যাই। আমি ড্রাইভারটিকে সাবধানে নিয়ে যেতে বলে চলে এসেছিলাম। চলে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমি! ওখানে থাকার সময় কেবলই মনে হয়েছিল ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এলাম বলে উনি আবার না টাকা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান!

জামা-প্যান্ট পালটে আমি চুলটা আঁচড়ে নিলাম। ড্রয়ার থেকে বাবার প্রেসক্রিপশনটা বের করে বুক পকেটে রাখলাম। দেখে নিলাম ব্যাক পকেটে মানিব্যাগটা আছে কি না! তারপর ভাবলাম, টিনটিনের নতুন মুভিটা দেখার কথা বলেছে তো পিঁড়ি। কে জানে কেমন হবে? বহুদিন হলে গিয়ে ফিল্ম দেখা হয় না। আসলে টিকিটের যা দাম!

কলিংবেলটা বেজে উঠল এবার। নির্ঘাত পিঁড়ি। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও, ছেলেটা এল তা হলে। মনখারাপ হলেই মানুষ বোঝে একা থাকার মতো অভিশাপ আর কিছু হয় না। জুতোটা পায়ে গলিয়ে আমি ফ্ল্যাটের চাবিটা নিলাম। একেবারে বেরিয়ে যাব।

দরজাটা খুলে আমি থমকে গেলাম! আরে, দিঠি, গজার বোন!

"তুই?" আমি অবাক হলাম।

দিঠি বলল, "মায়ের খুব শরীর খারাপ। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দাদা তাই তোমায় ডাকতে পাঠাল সমদা। তুমি যাবে প্লিজ?"

"নিশ্চয়ই। চল," আমি আর কথা না বাড়িয়ে এগোতে লাগলাম। কতবার বলেছি আমি গজাকে যে, ও যেন একটা মোবাইল রাখে। কিন্তু শুনবে আমার কথা! ফোন থাকলে তো আরও তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে পারত! লিফটের সামনে গিয়েই দেখি লিফট থেকে পিঁড়ি বেরোচ্ছে।

'কী গুরু? আরে দিঠি তুমি?" পিঁড়ি অবাক হল।

আমি কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বললাম সব।

"যেতে হবে?" পিঁড়ির গলায় কেমন যেন একটা চাপা অনিচ্ছা।

"চল," আমি কড়া গলায় বললাম।

পিঁড়ি আর গাঁইগুঁই করল না। আমরা তিনজন লিফটে ঢুকে গেলাম একসঙ্গে। আমার খারাপ লাগছে। ওই টাকাটা যদি কোনওমতে আমি জোগাড় করে দিতে পারতাম তবে এমনটা হয়তো হত না। গজা আমায় নিজে ডেকে ওদের অফিসে কিছু মাল সাপ্লাই করার অর্ডার পাইয়ে দিয়েছে। সামান্য টাকার কাজ, তবু কাজ তো! আর সেখানে আমি, বিয়ার খেয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ভুলভাল প্রমিস করে বসে আছি। সাহায্য না করা এক, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহায্য না করার মতো অপরাধ কমই আছে! আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। কাকিমার শরীর কতটা খারাপ? মানে আর ক'টা দিন কি আমি সময় পেতে পারি না? আমার চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল দিঠির কথায়, "সমদা তোমার কাছে টাকা আছে তো একটু? মানে দাদা বলেছিল প্রয়োজন হতে পারে।"

টাকা? লিফটা আমার খুব ছোট মনে হল হঠাৎ। চোখ বন্ধ করে দেখলাম দিলীপ কুমার খুব ঘামছে। কফিনের মতো লিফটে কেউ যেন গরম জল ঢেলে দিচ্ছে মাথায়। গরম! সত্যি! পৃথিবীটা পিচের ড্রামের মতো ফুটছে এখন! টাকা থাকলে তো গরম হয় শুনেছি, না থাকলেও এত গরম লাগে!

৫

একটা সময় পরে জীবনে এমন একটা সময় আসে, যেসময় আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, আমাদের সময়টা আমাদের নয়। আর যা আমাদের নয়, তার জন্য আমরা প্রচুর সময় অযথা নষ্ট করেছি। একটা সময় পর জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা বুঝি এবার সেই সময় এসেছে যখন আমাদের পুরনো সময় থেকে নিজেদের বের করে নতুন একটা সময় শুরু করতে হবে। ছেড়ে রাখা একটা বৃত্তকে আমাদের নিজেদেরই সম্পূর্ণ করতে হবে। বুঝি প্রথম প্রেমিক, দ্বিতীয় চাঁদ, তৃতীয় ছাগল ছানা বা চতুর্থ বাঁদর হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পঞ্চম বিটল্‌স হয়ে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে এবার। বুঝি সময় এসেছে একটা নতুন গল্প শুরু করার। একটা পজিটিভ, ফিল গুড, বৃত্তাকার গল্প। যা পড়ে কোনও না কোনও ফিল্ম ডিরেক্টর অন্তত আমার কাছে আসবেন আর এসে কয়েক লক্ষ টাকায় সেই গল্পের রাইট কিনে একটা রঙিন হিন্দি ছবি বানাবেন। আর বোঝাবেন, আমার এই শাল পাতা বা মাটির ভাঁড়ের মতো জীবনও ততটা ফালতু বা অদৃশ্য নয়। বোঝাবেন, এই দিয়ে কোনও বুদ্ধুর গল্প না হলেও অন্তত একটা পঞ্চম বিটল্‌সের গল্প বলা যেতেই পারে।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতে-আসতে এটাই মনে হল আমার।

কলেজজীবনে যখন আমি প্রাণপণ প্রেমে পড়েছি, যখন সারাদিন মাথায় ঘুরছে গানের দল করব আমি, সারাদিন নিজের মনে গুনগুন করছি বিটল্‌স-এর গান। সেই কলেজ লাইফে আমি যখন ভাবছি শুধু আমার নয়, তোমারও স্বপ্ন আছে। ভাবছি, বৃষ্টির পরে একটা দারুণ রোদ উঠবে। স্বর্গ বলে সত্যি আর কিছুর দরকার হবে না। তখন আমি নিজেকে মনে-মনে বিট্‌ল ভাবতাম। ভাবতাম জন, পল, জর্জ আর রিঙ্গোর পর আমি সম, পঞ্চম বিট্‌ল।

কিন্তু স্বর্গের দরকার বোধহয় পৃথিবীতে এখনও আছে। বোবো চলে

যাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে বসে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আমি সেই স্বর্গের ঈশ্বরকেই খুঁজতাম। বলতাম, "হে ভগবান, বোবোকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও।"

হয় ঈশ্বর কালা, নয়তো হেব্বি পারশিয়াল। যাকে দেয় তাকে শ্বাস ফেলতে দেয় না, আর যাকে দেয় না, তাকে শ্বাস নিতে দেয় না। সেই বোবো চলে যাওয়ার পর থেকেই আমার আর ঈশ্বরের মধ্যে একটা ঠান্ডা খিঁচ চলছে। যা এখনও অব্যাহত। তাই আজ আমাদের বাড়ি থেকে নতুন একখানা খবর নিয়ে বেরোবার পর সেই খিঁচ ভুলে আমার আর-একবার তাকে ডাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সামলে নিলাম আমি, খুব সামলে নিলাম। সে ঈশ্বর হতেই পারে, তাই বলে আমি মানুষ নই নাকি? আমি নিজেকে শক্ত করলাম। তবু মনে-মনে বোনের কথাগুলো ড্রপ খেতে লাগল।

আজ আমায় একবার ওই আর্কটিক ভিলেজে যেতে হবে। না, ওরা ডাকেনি। আমি নিজে থেকেই যাব। যেতেই হবে আমায়। কারণ আমি জানি ওখানে কাজ আছে। আমায় ওখান থেকে কাজ বের করতেই হবে। আমার টাকার দরকার এখন, অনেক টাকার দরকার।

আজ সকালে বোন ডেকেছিল আমায় ফোন করে। বলেছিল, "দাদা তুই আজ একবার আয়। খুব দরকার।"

আমি আজ এদিকে আসতামই। কারণ আর্কটিক ভিলেজে আমায় যেতেই হত।

আসলে সেদিন গজার সঙ্গে হাসপাতালের লবিতে দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার বেসামাল অবস্থায় আবেগপ্রবণ হয়ে বলা কথার কতটা গুরুত্ব।

গজা বলেছিল, 'মাকে তো ভর্তি করে দিলাম, এখন দেখি কত টাকা লাগে!"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। আসলে দিঠি ওই টাকা নেওয়ার কথাটা বললেও আমি নিতে পারিনি কিছু। আমার কাছে তো তেমন টাকাই ছিল না। তাই গজার কথায় চুপ করেছিলাম।

গজা আমার হাত ধরে বলেছিল, "কোথায় টাকা ধার দেয় জানিস তুই? আমার যে কী অবস্থা তোকে কী বলি। মায়ের গয়না আছে কিছু, সেটাই শেষ সম্বল। তাই ওগুলো বের করতে চাই না। যদি কিছু ধার পাওয়া যেত..."

আমি বলেছিলাম, "আমি চেষ্টা করে দেখব। আসলে, আমি নিজে তোকে বলেছিলাম টাকা দেব। কিন্তু আমি এমন অপদার্থ যে..."

গজা আমার হাতটা ধরেছিল, "দূর পাগল, আমি ওটা ধরিনি। আমরা তখন কী অবস্থায় ছিলাম বল। আসলে সমস্যাটা মাকে নিয়ে। মা তোর কথা শুনে ধরে বসে আছে। বলে সম ঠিক কিছু একটা করবেই। আমার কোনও কথা বুঝতেই চায় না। এখানে আসার সময়ও দিঠিকে বলেছিল সম ঠিক কিছু একটা করবে।"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। কাকিমার মনে এমন একটা আশা তৈরি হয়েছে আমার কথায়! আমার মনে হচ্ছিল জুতো খুলে নিজেকে মারতে। কাকিমা এখনও ভর্তি আছে। ওদের টাকার জোরও কমে আসছে ক্রমশ। আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা করতে হবে। যা বলেছি তার কিছুটা তো করতেই হবে। তিন-চারদিন ধরে এদিক-ওদিক চেষ্টা করে দেখেছি। কিছু করতে পারিনি। এর ভিতর পাশের ফ্ল্যাটের দাদা একবার জিজ্ঞেস করেছিল আমি গিয়েছি কি না ওই আর্কটিক ভিলেজে। মিথ্যেই বলেছি যে, যাওয়ার সময় পাইনি। কারণ গিয়েও যে কিছু করতে পারিনি সেটা জানাতে চাইনি। অন্যের সামনে আর নিজেকে অপদার্থ প্রমাণ করতে ভাল লাগে না। আজকাল ওই ফ্ল্যাটেও আমি বিশেষ যাই না। দাদার কাছে মিথ্যে বলা আর বউদির ওই প্রস্তাব, ভাবলেই আমার মুখটা তেতো হয়ে যায়। ভাবি, কবে যে এই ফ্ল্যাটের থেকে আমি পালাতে পারব!

তিন-চারদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর ঠিক করেছিলাম যে করেই হোক ওই সেনাপতিকে পরাজিত করতেই হবে আমায়। নইলে এই যুদ্ধে আমার পরাজয় অবধারিত। আর তারপরই আজ সকালে ফোন এসেছিল আমার বোন টুইয়ের।

বাড়িতে ঢুকে আমি অবাক হয়েছিলাম, বোন আজ কলেজ যায়নি!

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী রে, কলেজ যাসনি কেন?"

বোন উত্তর না দিয়ে বলেছিল, "আগে তুই স্নান-খাওয়া কর। তারপর বলছি।"

আমি সন্দেহের গলায় বলেছিলাম, "জেঠুরা কিছু বলেছে?"

মাথা নেড়েছিল বোন। বলেছিল, "না, না। সেসব নয়। বলছি তোকে। আগে স্নান-খাওয়া কর।"

আমি বুঝেছিলাম বোন কিছু বলবে না। বাবা যদি কিছু বলে সেজন্য বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। কিন্তু বাবা আমার দিকে না তাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হয়েছেটা কী? এমন সাসপেন্স রাখার মানে? গলায় কাঁটার মতো বিঁধছিল কৌতূহল। কী হতে পারে? কী বলবে বোন?

যতটা দ্রুত সম্ভব স্নান-খাওয়া সেরে আমি বসেছিলাম বোন আর বাবার সামনে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী বলবি আমায়? সকালবেলায় ফোন করে এমন জরুরি তলব দিলি আর এখন বলার সময় এমন করে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন? কী বলবি?"

বোন কিছু বলার আগেই বাবা বোনকে বলেছিল, "আমার মনে হয়, এতদিন যখন বলতে হয়নি তখন আর বলিস না। আমি দেখি যদি পারি কিছু বন্দোবস্ত করতে।"

"মানে?" আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল, "ব্যাপার কী? কী বলছ তোমরা? আমি কী জানি না?"

বোন বলেছিল, "বাবা, আর না। দাদাকে এবার বলতেই হবে। তুমি একদম বারণ করবে না।"

"বল আমায়," আমি বোনের দিকে সোজা তাকিয়েছিলাম, "কী হয়েছে?"

বোন বাবার দিকে একবার তাকিয়ে আমায় বলেছিল, "আমি যখন এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হই, বাবা একজনের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করেছিল। সেটা প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গিয়েছে। আমি জানতাম না। তুইও জানতিস না। সেই লোকটা এখন এসে খুব প্রেশার দিচ্ছে। টেন পারসেন্ট সুদে টাকা দিয়েছিল লোকটা, এখন বছর দেড়েক পর সুদ সমেত ফেরত চাইছে টাকা।"

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম, "কী বলছে বোন?"

বাবা চুপ করেছিল কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল, "কিছু উপায় ছিল না রে। ওর পড়ার খরচটুকু প্রাথমিকভাবে কী করে জোগাড় করতাম বল!"

আমি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করেছিলাম। সত্যি তো, আমার কি কথা বলা সাজে? সেসময় যখন বাবা টাকাটা দিয়েছিল আমার তো একবারও মনে হয়নি কোথা থেকে এল টাকাটা! আমি ভেবেছিলাম, বাবা হয়তো ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে টাকা দিচ্ছে। আমি এমন আহাম্মক যে, বুঝতেই পারিনি আমাদের ওসব ডিপোজিট-টিপোজিট কিছু নেই।

আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলাম, "এখন উপায়?"

বোন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "উপায় হল, লোকটার মুশকো টাইপের মেয়েকে তুই যদি বিয়ে করিস তবে লোকটা টাকাটা নেবে না। উপরন্তু আরও লাখ খানেক টাকা দেবে তোর ব্যবসাটা বড় করার জন্য। বুঝেছিস?"

বিয়ে! আমি কী বলব বুঝতে না পেরে তাকিয়েছিলাম বোনের দিকে। বোন বলেছিল, "জানি, তুই বিয়ে করবি না। আর করবিই বা কেন? তাও এমন অসম্মানজনকভাবে? আমিই করতে দেব না এই বিয়েটা। তাই লোকটাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। তবে লোকটাও ত্যাঁদোড়, যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে গিয়েছে যে, টাকা না পেলে ও নাকি আমাদের ভিটেছাড়া করবে। ভাব একবার!"

"তবে?" আমি যে বয়সে বোনের চেয়ে বড়, সেটা মনেই পড়ছিল না আমার।

"দাদা," বোন অসহায় গলায় বলেছিল, "বাবা বাড়ির দলিলটা বন্ধক রেখেই... মানে..."

আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। বাবা এটা কী করেছে? একবার আমায় বলল না পর্যন্ত! কিন্তু তারপরই মনে হয়েছিল, বললে আমি কীই বা করতাম? কিচ্ছুই তো করতে পারতাম না। উপরন্তু বোনটার এঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাও হত না। আমি যে কী অপদার্থ!

বোন বলেছিল, "সময়মতো মাস্টার্সটা করলে মাস্টারিটা অন্তত করতে পারতিস তুই। কিছুই তো করলি না। কারণ কী, না, একটা মেয়ে তোকে ছেড়ে চলে গিয়েছে! আমি তো ভাবতেই পারি না এতটা ইরেসপন্সিবল কী করে হতে পারিস তুই! তার ফলটা এখন আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে! তবু বলব, দাদা তুই কিছু একটা কর। এই সময়টাকে অন্তত চলে যেতে দিস না প্লিজ!"

একটা সময় পর জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা বুঝি এবার সেই সময় এসেছে যখন আমাদের পুরনো সময় থেকে নিজেদের বের করে নতুন একটা সময় শুরু করতে হবে। আমি কুইন সিনেমার সামনে থেকে অটো ধরলাম। সামনে ড্রাইভারসহ তিনজনের সঙ্গে চড়াই পাখির মতো ব্যালান্স করে বসে ভাবলাম, আর সময় নষ্ট নয়, এবার কিছু একটা করতেই হবে।

কাকিমা বলেছে কিছু একটা করব আমি। টুই বলছে আমায় কিছু করতে হবে। আকাশের পাখি, মাটির পিঁপড়ে, গাছের হাওয়া সকলেই বলছে, কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কী করব? করবটা কী আমি? ঠোঁট সেলাই করে দিয়ে কেউ যদি জল খেতে বলে, মানুষটা জলটা খায় কেমন করে?

বিকাশ সেনাপতি আমায় দেখেই বলল, "আরে, আপনি আবার এসেছেন?"

"আমি জানি, আপনাদের কাছে আমার জন্য সুযোগ রয়েছে। তাই যদি একটু কনসিডার করেন। আমি ঠিক সিনসিয়ারলি আপনাদের সার্ভ করব।"

বিকাশ মাথা নাড়ল, "দেখুন ভাই, আপনি এমন করবেন না। আমি আপনার কথা আমাদের বসকে বলেছিলাম। উনি জাস্ট আমায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আর আজ তো এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাই বলা যাবে না। আজ এখানে ওয়র্কারদের নিয়ে একটা অশান্তি হয়েছে। কাজ বন্ধ আছে। সবার মাথা গরম হয়ে আছে একদম। উপরে এই নিয়েই আলোচনা চলছে। আপনি আজ আসুন।"

"উপরে ওঁরা আছেন?" আমার মনে হল এটাই সুযোগ। এই লোকটা কিছুতেই আমায় যেতে দেবে না উপরওলাদের কাছে। কিন্তু আমি যদি একে কাটাতে না পারি তবে গোল দেওয়া অসম্ভব।

বিকাশ কিছু বলতে গিয়েও থমকাল। দেখলাম টকটকে গায়ের রঙের রাজপুত্রের মতো দেখতে একটা লোক মুখ-চোখ লাল করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোনওদিকে না তাকিয়ে গটগট করে চলে গেল। বিকাশ লোকটার চলে যাওয়ার দিকে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম এই সুযোগ। বিকাশ আমার দিকে তাকানোর আগেই আমি ছোট্ট একটা চুক্কি দিয়ে ওকে কাটিয়ে উপরের সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগালাম।

বিকাশের বুঝতে সময় লাগল একটু। কিন্তু তারপর বুঝতে পেরেই, "এই, কী হচ্ছে?" বলে প্রবল বেগে দৌড়ে আমায় ধরে ফেলল অর্ধেক সিঁড়িতেই।

আমার হাত টেনে বলল, "কী মশাই? পাগল নাকি? বয়স কত আপনার? এটা অফিস, আর আপনি আমার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছেন!"

আমি বললাম, "আমায় যদি যেতে না দেন, আমি কিন্তু চিৎকার করব। দেখব তখন আপনাদের মালিকরা বেরিয়ে আসেন কি না!"

বিকাশ কিছু বলতে গিয়েও বলল না। আমার দিকে তাকাল ভাল করে। তারপর মাথা নাড়ল নিজের মনে। বলল, "আপনি সত্যি ডেসপারেট! ঠিক আছে আপনি ওয়েট করুন, আমি বলছি উপরে। দেখি কী হয়।"

আমি বিকাশের পিছন-পিছন উপরে উঠে ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়ালাম।

সামনে ঘষা কাচের দরজা। তবে মেঝেটা এখনও এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। বুঝলাম এটাই এখানকার অস্থায়ী অফিস। ফ্রস্টেড কাচের ওই প্রান্তে অস্পষ্ট ছায়ার নড়াচড়া দেখে বুঝলাম ভিতরে লোক রয়েছে। আমার কেন জানি না একটু ভয় লাগল। আমি কি বেশি করে ফেলেছি। কী করব এখন? চলে যাওয়া তো আর যায় না। আমি এদিক-ওদিক সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে দাঁড়ালাম।

সেখান থেকে দেখলাম বিকাশ দরজার বাইরে আলতো নক করে দরজাটা খুলে মাথা গলাল। তারপর আস্তে করে বলল কিছু। কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপরই একটা ভাঙা-ভাঙা মহিলা কণ্ঠ প্রায় চিৎকার করে উঠল, "এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? কোথাকার কে এক পাতি সাপ্লায়ার, তার সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে? ভাগিয়ে দিন, ভাগিয়ে দিন ওকে।"

আমার গায়ে ছ্যাঁকা লাগল যেন! পাতি? সাপ্লায়ার? আমি? হঠাৎ নিজেকে খুব ছোট আর সামান্য মনে হল। মনে হল, আমি এরপরও কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব? টাকার কত দরকার আমার যে, এমন কথা শোনার পরও দাঁড়িয়ে থাকব? অন্য-কোথাও কি আমার রোজগারের কোনও সুযোগ আমি করতে পারব না?

আমি পিছন ফিরে দৌড় লাগালাম। আর না। আর এসব শুনব না আমি। আমার চাই না এসব কাজ। আমি দৌড়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আর সামনের দরজার দিকে গেলাম না। ছুট লাগালাম পিছনের দরজার দিকে। অপমানে মাথা-কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে, কথাগুলো হয়তো খুব ধারালো ছিল না, কিন্তু কথা বলার ধরনটার ভিতরে একটা ভয়ানক মার ছিল। একদম শক্তিশেল যাকে বলে। মরমে পশিয়া আমার কান গরম করে দিয়েছে।

আমি পিছনের দরজা দিয়ে কম্পাউন্ডের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখনও হাঁফাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে, তেষ্টায় গলা চিরে রক্ত বেরোবে। আমি চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম।

"কালপুরুষ দেখেছিস? আরিয়ন? তার কোমরের কাছের পর-পর তিনটে তারা দেখেছিস? জানিস মাঝেরটাকে বলে নেবুলা। পৃথিবী থেকে ওটা পনেরোশো আলোকবর্ষ দূরে। আর নেবুলাটার নিজের ব্যাস নব্বই আলোকবর্ষ। ভাবতে পারিস কত বড়? ওটাকে বলে নার্সারি অব স্টার্স। আমাদের মতো গ্যালাক্সি ওখানে অসংখ্য আছে। ভাব একবার। হাব্‌ল টেলিস্কোপ না আবিষ্কার করলে এসব জানতে পারতিস? পারতিস না। তবে? আর তুই সামান্য এটা পারবি না? কী রে, পারবি না?"

পাগলটাকে আমি আগেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু এমন কথা কোন পাগলে বলে?

আমি দেখলাম পাগলটা চলে যাচ্ছে। হাওয়ায় হাত তুলে আঁকিবুকি কেটে নিজের মনে কথা বলতে-বলতে চলে যাচ্ছে একা। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কাকিমার হাসপাতালের মুখটা মনে পড়ল। মনে পড়ল, বাবার বিষণ্ণ হয়ে মাথা নিচু শরীরটা। বোনের কষ্টের থেকে, অপমানের থেকে ছিটকে বেরোনো কথাগুলো।

হাব্‌ল টেলিস্কোপ এতটা পেরেছে? মানুষ এতটা পেরেছে? আর আমি? আমি এক-দেড়লাখ টাকা জোগাড় করতে পারব না? চারটে বাচ্চা ছেলের গানকে প্রথমে কেউ পাত্তা দেয়নি, কিন্তু তারপর গোটা বিশ্ব তাঁদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়েছিল। আর আমি... আমি... পঞ্চম বিট্‌ল হয়ে আমি এটুকু পারব না?

বোবোর গল্প

দ্বিতীয় ভাগ

কলকাতা একটা সমুদ্র। এতে ছোট-বড় নানা মাপের প্রাণীরা ভেসে বেড়াচ্ছে আপন খেয়ালে, নিয়মে। তিমি মাছের মতো বড়-বড় বাড়ি,

হাঙরের মতো ফ্ল্যাট, ক্লান্ত অক্টোপাসের মতো জীর্ণ বসতি। আর তার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করা জেলি ফিশের মতো গাড়ি আর বুদ্বুদের মতো মানুষজন।

বোবোর মাঝে-মাঝে কেমন যেন ভয় লাগে! মনে হয় সবটাই কি দুঃস্বপ্ন? ও কি সত্যি মাটির উপরে বেঁচে আছে? নাকি জলের তলায় অন্য-এক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও? ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে যায়! মনে হয় এবার মারাই যাবে।

"এসি বন্ধ করো তো, আমি জানালার কাচটা নামাব," বোবো গণেশকে বলল।

গণেশ অবাক হল, "বাইরে খুব ধুলো ম্যাডাম, গরমও। কষ্ট হবে আপনার।"

"যা বলছি করো," বোবো রেগে বলল, "আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

গণেশ আর কথা না বাড়িয়ে এসি বন্ধ করে জানালার কাচ নামিয়ে দিল।

বোবো জানালার বাইরে মাথা বের করে রাখল একটু সময়। বাইপাস দিয়ে গাড়ি ছুটছে হুহু করে। সন্ধের শহরের হাওয়া তার বিষ নিয়ে চোখ-মুখ ছুঁয়ে গেল ওর। বিষ, তবু আজ সেটাই ভাল লাগল বোবোর।

"কী রে, কী করছিস?" নাঙু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

বোবো আবার নিজের জায়গায় বসে মাথাটা হেডরেস্টে রাখল।

"বোবো," নাঙু চিন্তিত হয়ে বাঁহাতটা বাড়িয়ে মাথাটা ছুঁল ওর, "শরীর খারাপ করছে তোর?"

"না, ক্লান্ত লাগছে নাঙু। খুব ক্লান্ত লাগছে।"

"তাই?" নাঙু চিন্তিত গলায় বলল, "আজ সল্টলেকে যেতে হবে জানিস তো। কী দরকার ছিল ওই গারমেন্টসের ওখানে যাওয়ার! পইপই করে বারণ করলাম। আমার কথা শুনলি! আর গেলি যখন, তখন সেখান থেকে সোজা দিদির, মানে সোনার বাড়িতে চলে গেলে পারতিস। আবার সেই আলিপুরে ফিরলি, সেখান থেকে আবার ঠেঙিয়ে সল্টলেক! শরীরটা তো হাড়-মাংসের হয়, লোহার তো নয়। এত অত্যাচার সহ্য করতে পারে! দ্যাখ কেমন শরীর খারাপ করছে এখন!"

বোবো নাঙুর দিকে না তাকিয়ে বাইরের আলো-অন্ধকারে চোখ রেখে বলল, "তুমি আমায় ছোটবেলায় একটা গল্প বলতে মনে আছে নাঙু?"

"কোনটা বল তো?"

"একটা ছোট্ট রাজকুমারী ছিল। আর একজন দৈত্য তাকে চুরি করে এনে আটকে রেখেছিল বড় একটা রাক্ষুসে তিমি মাছের পেটে। সেখানে বসে সারাদিন রাজকুমারী গান গাইত। আর ভাবত কে তাকে বাঁচাবে! তারপর একরাতে এক পরি স্বপ্নে এসে বলল, একজন রাখালছেলে এসে বাঁচাবে সেই রাজকুমারীকে। মনে আছে তোমার?"

নাঙু হাসল, "আছে। সেটা এখনও তুই মনে রেখেছিস?"

বোবো বলল, "রাখাল ছেলে কবে আসবে নাঙু? রাজকুমারী যে বুড়ি হতে চলল!"

"বোবো," নরম করে ডাকল নাঙু। "কী হয়েছে মা? এমন করে বলছিস কেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোবো, "বাদ দাও। আমার বয়স বাড়ছে তাই হয়তো ভুল বকছি।"

নাঙু হাসল, "হ্যাঁ, বুড়ি হয়ে গিয়েছিস তো। শোন, টেনশন নিস না এত। তুই আজ নিজেই তো গিয়ে দেখলি যে, ইক্কিদের ওই শার্টের অর্ডারটা আমরা কমপ্লিট করে ওদের দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমাদের প্রডাকশন একটু পিছিয়ে আছে। তবে ঠিক মেকআপ করে দেব আমরা। জানি ডোঙারিয়ার জমিটা নিয়েও তুই বেশ টেনশনে আছিস। কিন্তু দেখবি ঠিক কাটিয়ে উঠবি এটাও। হ্যাপি লিভিংয়ের রহস্য হল, টেনশন-ফ্রি লিভিং। এটা ফলো করে চল।"

"তুমি তো জানই ওই জমিটা আমি ব্যবসার কাজে ব্যবহার করব না। ওটা আমার নিজের একটা ইচ্ছে-প্রকল্প বলতে পার। একটা ওল্ড এজ হোম আর আয়ুর্বেদিক মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টের কালটিভেশন। তপোবনের মতো করে সাজাব জায়গাটাকে। একটু দূরেই গঙ্গা। কী দারুণ দৃশ্য হবে ভাব একবার।"

নাঙু হাসল, "এখানে একটা হাউজিং করলে কত টাকা লাভ করতে পারতিস বল তো! কিন্তু..."

"হাউজিং," বোবো কষ্টের চোখে তাকাল নাঙুর দিকে, "তুমিও এমন বলবে!"

"আমার কথা শেষ করতে না দিলে তো এমনই মনে হবে যে, আমিও ক্রটাস!" নাঙু হাত তুলল, "আমাদের সমস্যা এটাই। আমরা কেউই পুরোটা শুনি না। তার আগেই ওপিনিয়ন ফর্ম করে ফেলি। আরে বাবা, আমি বলছি, তুই দারুণ ভেবেছিস। নতুনরা যদি এমন না ভাবে তো কারা ভাববে! সবাই যদি সিমেন্টের তৈরি দেশলাই বাক্স বিক্রি করে, তবে মানুষের স্বপ্নের কী হবে? সেটা রক্ষা করবে কে?"

বোবো হাসল এবার, "তুমি না নাঙু! খুব ঘুরিয়ে দিলে কথাটা!"

নাঙু বলল, "তুই আমার 'কিন্তু'-টা মিস করে গেলি যে। যাই হোক শোন, আমাদের সবার জীবনটাই খুব ডিপ্রেসিং। কিন্তু শুধু সেটা নিয়ে পড়ে থাকলে হবে?"

"ঠিক বলেছ," বোবো মাথা নাড়ল, "আমি সত্যি খুব ভুলভাল হয়ে গিয়েছি। বয়স হচ্ছে বলেই বোধহয়। আই নিড টু চেঞ্জ, আই নো। কিন্তু, কী করব বলো, আমার মনের প্রোগ্রামিংটাতেই শিওর কোনও গন্ডগোল আছে।"

নাঙু হেসে সোজা হয়ে বসল, "তা বটে। যথেষ্ট বুড়ি হয়েছিস তুই। তবে বিয়ে করছিস না কেন? ইক্কিকে কাটিয়ে চলছিস কেন তুই?"

বোবো কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কলেজের ছেলেটা তোকে খুব বধ করে গিয়েছিল, না? সবাইকে লুকিয়ে যখন প্রেমটা করলি, বিয়েটা করতে পারলি না? সাধুগিরি করে মা-বাবার কাছে এনেছিলি কেন ছেলেটাকে? তাও কিচ্ছু না বলে একদম দুম করে হাজির করেছিলি কেন?"

বোবো কিছু না বলে মাথা নামিয়ে নিল। গলার কাছটা কেমন ভার-ভার লাগছে। সত্যি তো, বাড়িতে কোনও কিছুই ও বলেনি সমন্বয়ের সম্বন্ধে। একদম কিচ্ছু বলেনি। আর প্রথমদিন বাড়িতে নিয়ে এসেই বয়ফ্রেন্ড আর বিয়ে করতে চায় বললে কি কেউ মেনে নেবে? মা যদিও আঁচ করত, তবু ওই প্রথমদিনই অমন বলাটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। মা কিছু বলেনি সঙ্গে-সঙ্গে। সমকে তার চারদিন পর আসতে বলেছিল। আর এই চারদিনের ভিতরে বোবোকে নরক দর্শন করিয়ে এনেছিল মা। মারধোর থেকে ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেলিং, কিচ্ছু বাদ দেয়নি। শেষে ডাক্তার ডাকিয়ে তাকে দিয়ে বলানো হয়েছিল যে, বোবো এমন করলে মায়ের যা হার্টের কন্ডিশন, তাতে মা মারা যাবে।

চতুর্থদিন সমকে যেভাবে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা আজও মনে আছে ওর। এমনকী সকলের সামনে বোবোকে দিয়ে বলানোও হয়েছিল যে, সম যাতে চলে যায়। সম দু'বছর সময় চেয়েছিল বোবোর কাছে। তার উত্তরে সবার সামনে বোবো বলেছিল, "না, তুই চলে যা। চলে যা একদম। কোনওদিন আমায় তোর মুখ দেখাবি না। একদম দেখাবি না, বুঝলি?"

সম-র ওই তাকিয়ে থাকাটা এখনও মনে লেগে আছে বোবোর। অমন ডুবতে বসা মানুষের মুখ ও আর কোনওদিন দ্যাখেনি। সেদিন কোনও কথা বলেনি সম। শুধু অদ্ভুত বড়-বড় দু'টো চোখ তুলে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর কাঁধের নীল ঝোলা ব্যাগটা চেপে ধরে মাথা নামিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ির গেট দিয়ে।

বোবো একছুটে চলে এসেছিল দোতলায় ওর নিজের ঘরে। কাচের স্লাইডিং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। দেখেছিল, চলে যাচ্ছে সম। কাঁধে নীলব্যাগ, না গোঁজা গোলাপি শার্ট, মাথাটা সামান্য ডানদিকে হেলিয়ে একা-একা ট্রামলাইন পেরিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। জলভরা চোখে ওই চলে যাওয়াটুকু দেখেছিল বোবো। মনে-প্রাণে চাইছিল, একবার যেন ফিরে তাকায় সম, একবার যেন ওর দিকে

তাকায়! না, ফিরে তাকায়নি সম। আটবছর হয়ে গিয়েছে, তারপর থেকে আর কোনওদিন ফিরে তাকায়নি সমন্বয়।

"কী ব্যাপার বল তো? কী হল?" নাঙু হালকা গলায় বলল।

বোবো অসহায়ভাবে নাঙুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তখন কেন ছিলে না নাঙু?"

নাঙু বলল, "কী করব, বল! রাজকুমারীকে বাঁচাবার সাধ্য আমার ছিল না রে মা।"

বোবো অস্ফুটে বলল, "রাজকুমারী? তবে কেন রাখাল ছেলের গল্প বলেছিলে আমায়? সে তো চলেই গেল।"

"আর না বোবো, আর না। সামনের দিকে তাকাতে হয় বলেই আমাদের সামনে দু'টো চোখ থাকে। আনহ্যাপি ইজ দ্য ম্যান হু ডোয়েল্ট ইন দ্য পাস্ট। শোন, তোকে একটা কথা বলাই হয়নি।"

বোবো অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, "কী? কাজের কথা নিশ্চয়ই?"

"আরে তোকে বলাই হয়নি। সেদিন যে ছেলেটা এসেছিল না, ওই যে, যার সঙ্গে দেখা করিসনি তুই! বিকাশকে ধমকে তাড়িয়ে দিলি। ওই ছেলেটা তার দু'দিন পরে এসেছিল। আমি অফিসরুম থেকে দেখে তো অবাক! আরে এই ছেলেটাই তো আমার সেই অ্যাক্সিডেন্টের সময় হেল্প করেছিল! কিন্তু আমি আর সামনে যাইনি। শুধু বিকাশকে ডেকে ওই ছেলেটাকে কিছু কাজ দিতে বলেছি। আমাদের ওই আর্কটিক ভিলেজের ডুপ্লেগুলোতে তো একটা রিল্যাক্সিং হাট থাকবে। তার মাথায় কিছু তালপাতা ধরনের আর্টিফিশিয়াল ছাউনি দেওয়া হবে। আমি বলেছি ছেলেটাকে ওর অর্ডার দিতে। প্রথমে স্যাম্পেল নিয়ে আসবে, তারপর সেগুলো অ্যাপ্রুভ করার পর বাল্ক রুফিং মেটিরিয়্যাল দেবে।

"তা সামনে ডাকলে না কেন? আর ওই রুফিং মেটিরিয়্যাল তো বিদেশ থেকে আনার কথা ছিল। তার কী হল? একটা এজেন্ট তো এসেছিল তার জন্য!" বোবোর অবাক লাগল।

"আরে সে ব্যাটা ঝুলিয়েছে। বিদেশি কোম্পানি বলছে, অত কম কোয়ান্টিটি ওদের পোষাবে না। আমাদের এখন শিয়রে সংক্রান্তি। আমি কয়েকটা জায়গায় পাত্তা লাগিয়েছি। আমাদের বেগতিক দেখে সব চারগুণ দাম চাইছে! তাই ছেলেটাকে দিয়ে ট্রাই নিচ্ছি। পারলে ভাল, না হলে বেশি দাম দিয়েই কিনতে হবে।"

"কেন ফালতু রিস্ক নিচ্ছ নাঙু। কোথাকার কে এক ছেলে তাকে বিশ্বাস করছ! কেন?"

নাঙু হাসল, "ধরে নে আমি নিজের জন্য একটা কাজ করছি। ছেলেটা নতুন। নতুনদের তো সুযোগ দিতে হবে। কাউকে না কাউকে তো দিতেই হবে। আর ধরে নে, আমি ছেলেটার প্রতি এভাবেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, তা ছেলেটাকে ডাকলে না কেন?" বোবো বুঝল নাঙু একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

"দ্যাখ," নাঙু নিজেকে সামলাল, "আমার মনে হয়েছিল ও যথেষ্ট খুদ্দার ছেলে। আমায় হেল্প করার সময় আমায় দেখে তো বুঝতে পেরেছিল, যে লোকটা এমন গাড়ি চড়ে সে সাধারণ জীবনযাপন করে না। কিন্তু নিজের নামটা পর্যন্ত বলেনি। আমায় ধন্যবাদ ছাড়া অন্যকিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। তাই মনে হয়েছিল, আমায় সামনে দেখলে ভাববে ওর সাহায্যের প্রতিদান দিচ্ছি। তাই আড়াল থেকেই বিকাশকে নির্দেশ দিয়েছি। তবে বলেছি, তাড়াতাড়ি করতে। আসলে প্রথম ফেজের কাজটা তো শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি। মার্কেটিংয়ের লোকজন আমার মাথা খাচ্ছে। যদি তাড়াতাড়ি না দিতে পারি, তা হলে পরের ফেজের জন্য বুকিং ভাল হবে না।"

বোবো বিরক্তি নিয়ে বলল, "নাঙু, আমার এখন এসব ভাল লাগছে না! যে তোমায় হেল্প করেছে, তুমি আড়াল থেকে তাকে শোধ দিচ্ছ। নাইস। কিন্তু প্লিজ আর কাজের কথা নয়। আমাকেও মার্কেটিং থেকে বলছিল নানা কথা। আমি জানি। আর কোন ছুটকো সাপ্লায়ার কোন মেটিরিয়্যাল দেবে বা দেবে না, সেটা এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে না। এমনিতেই মাথা গরম হয়ে আছে। লেট্স নট টক অ্যাবাউট অল দিস।"

নাঙু বলল, "আহা, তোর জানা দরকার তো। আর মালের কোয়ালিটি তো আমাদের এঞ্জিনিয়াররা দেখবে। কোনও ফাঁকি দেওয়া যাবে না।"

বোবো আরও কিছু বলত, কিন্তু গাড়িটা দিদির বড় বাংলোর সামনে এসে পড়ায় চুপ করে গেল।

নাঙু গণেশকে বলল, "আমরা নামছি, তুই গাড়িটা পার্ক করে সামনের সিট থেকে সোনার গিফ্টটা নিয়ে আসবি। আর এসে আমার নয়, বোবোর হাতে দিবি, কেমন?"

বাংলোর গেটটা লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরি। এখন থেকে ভিতরের দোতলার ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে। কাঠ আর কাচের ডিজ়াইন করা জানালা দিয়ে দোতলার ঘরের একটু অংশও চোখে পড়ছে। তবে বাকিটা বড়-বড় দেবদারু আর ঝাউ গাছের আড়ালে।

দারোয়ানটা ওদের ভাল করেই চেনে। গেট খুলে দিয়ে স্যালুট করল লোকটা। গণেশ পিছনে অপেক্ষা করছে। বোবোরা ঢুকে গেলে গণেশ গাড়িটা ঢুকিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে পার্কিং এরিয়াতে রেখে দেবে।

বারান্দাতেই দিদির মেয়ে ঝিলম দাঁড়িয়েছিল। বোবোকে দেখে একছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল ওর, "মিসি সো লেট? অল ওয়র্ক অ্যান্ড নো প্লে মেক্স জিল আ ডাল গার্ল। ওন্ট ইউ নো দ্যাট?"

বোবো হাসল। ঝিলমের বয়স, নয়। তবে এখনকার মেয়ে তো, তাই মনে-মনে অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। ও বলল, "কী করব ঝিল, জানিস তো টাকা ছাপতে সময় লাগে। তাই বেশি কাজ করতে হয়। তা, তোর দাদা তো হস্টেলে, মিস করছিস না?"

ঝিলম হাসল, "এটা তো রুটিন। দাদা তো বাইরেই থাকে।"

নাঙু ঝিলমের মাথায় হাত বুলিয়ে ভিতর দিকে পা বাড়াল। বোবোও যেতে চাইছিল, কিন্তু দেখল, ঝিলম নাঙুর চোখ এড়িয়ে ওকে টেনে বারান্দায় দাঁড়াতে বলল। বোবো ভিতরে না গিয়ে একটু দাঁড়াল।

"কিছু বলবি?"

ঝিলম বলল, "ব্যাড নিউজ মিসি, দ্যাট বয়ফ্রেন্ড অব ইয়োরজ ইজ হিয়ার।"

"ইক্কি?" চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বোবোর। অবশ্য এটা এক্সপেকটেড। দিদি ইক্কির নামে একঢোঁক জল বেশি খায়।

"ইয়াপ," ঝিলম মাথা নাড়ল, "মায়ের যে কী হয়েছে! ডু এনি সেন উওম্যান অব হার এজ সেলিব্রেট হার ওন বার্থডে?"

"আমাদের সোসাইটিতে তো এমনটাই হয়। আর দিদি তো জাস্ট থার্টি ফাইভ। বার্থ ডে সেলিব্রেট করতেই পারে।"

ঝিলম মাথা নাড়ল, "আওয়ার সোসাইটি, মিন্স রিচ ক্ল্যান, রাইট? ডু ইউ থিঙ্ক দে আর সেন? টাকা ছাড়া আর শো অফ করা ছাড়া কেউ কিছু বোঝে? আমি বড় হয়ে সোশ্যাল ওয়র্ক করব। না না, নট লাইক দোজ পাউডার কোটেড, ক্যামেরা চেজিং ওয়ানস। দ্য রিয়্যাল ওয়ান। নট লাইম লাইট ক্রেজি। বাট ক্লোজ টু রিয়্যাল পিপল। আই উইল নট বি ইনসেন লাইক ইওর ক্ল্যান।"

বোবো হাসল। অনেকক্ষণ পর ভাল করে হাসল ও। ঝিলম খুব মিষ্টি। ওর মতো মেয়েরা হয় কেউ মিস ইউনিভার্স হতে চায়, নয়তো করিশ্মা কপূর। কিন্তু ঝিলম অন্য-একটা পৃথিবীর কথা জানে। ফুটপাথের উপর উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে যে-পৃথিবীটা, তার কথা জানে ঝিলম। আর তাদের পাশে দাঁড়াতে চায় ও। তাই বোবোদের ইনসেন লেয়ারটাকে ও কথায়-কথায় ছুড়ে ফেলে দেয়।

হঠাৎ সম-র একটা কথা মনে পড়ে গেল বোবোর। সম বোবোর বড় আর দামি গাড়িটা দেখে বলত, "এমন গাড়িতে চড়ে বলেই তোদের সমাজের লোকজন ইনসেন হয়। আচ্ছা, এত ইনসেনের মাঝে তুই কোথা থেকে বনলতা সেন হয়ে গেলি বল তো?"

বোবো নিজের মনে আবার হাসল একটু। সম সবসময় কতরকম কথা বলে যেত!

"কী রে, তোরা কি বাইরেই থাকবি?" দিদি বেরিয়ে এল বারান্দায়।

বোবো কিছু বলতে গিয়েও বাধা পেল। গণেশ বড় একটা প্যাকেট নিয়ে এসে দিয়ে গেল বোবোর হাতে। বেশ ভারী প্যাকেটটা। চন্দন কাঠের একটা বজরা আছে এতে। শোপিস। খুব সুন্দর। মাইসোর থেকে আনানো। দিদির জন্য নিয়ে এসেছে বোবো।

প্যাকেটটা দিদির হাতে দিয়ে বোবো বলল, "হ্যাপি বার্থ ডে দিদি।"

দিদি প্যাকেটটা হাতে ছুঁইয়ে ওর পিছনে দাঁড়ানো কাজের মেয়েটাকে দিয়ে দিল। তারপর বলল, "এমন মুখ করে বলছিস কেন? আমার জন্মদিন আজ। কোনও খারাপ দিন তো নয়!"

বোবো কিছু না বলে দিদির পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করল।

"দাঁড়া, দাঁড়া," দিদি হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল ওকে, "কী ব্যাপার তোর? আমায় অ্যাভয়েড করছিস? কেন আমায় দেখলেই তুই এমন করিস? কী করেছি আমি তোর?"

বোবো নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল, "দিদি, কিছু করিনি। চল, ভিতরে চল।"

"কিছু করিসনি মানে?" দিদি রাগের গলায় বলল, "ভেবেছিস আমি বুঝিনি কী হয়েছে?"

বোবো এবার শক্ত গলায় বলল, "কী হয়েছে বলে তোর মনে হয়?"

"ইক্কি। আমি জানি তুই রেগে গিয়েছিস আমি ইক্কিকে নেমতন্ন করেছি বলে। ঠিক না?"

বোবো দিদির চোখে চোখ রাখল, "ও তাই? তবে তো জেনেই গিয়েছিস। হ্যাঁ, ধর তাই আমার বিরক্ত লাগছে।"

"ও আমি ঠিক ধরেছি তবে!" দিদি ফুঁসছে, "আমি কোথায় চাই তোর ভাল জায়গায় বিয়ে হোক, তুই ভাল থাক! আর সেখানে আমায় তুই দোষারোপ করছিস? এখনও সেই ছেলেটার ভূত মাথা থেকে যায়নি তোর, না? সেই ছেলেটা তোর মাথা এমন করে খেয়েছে! একটা ছোটলোকের জন্য..."

"দিদি," বোবো চিৎকার করে উঠল, "আর-একটা বাজে কথা বললে আমি চলে যাব। ডেকে এনে আমায় এসব বলবি ঠিক করেছিস!"

বোবোর আচমকা চিৎকারে দিদি একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর কিছু বলবে বলে মুখ খুলতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে একটা গলা এল, "কোন ছোটলোক? কার জন্য ইউ আর মেকিং সো মাচ নয়েজ?"

দিদি কিছু বলতে গিয়েও সামলাল নিজেকে। আর বোবো দেখল ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ইক্কি। ইক্কির চোখ ওর দিকে স্থির।

ইক্কি ধীর গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, "দিদি কার কথা বলছে বোবো? কোন ছেলে? কে তোমার মাথা খেয়েছে? আর ইউ হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার? কারও সঙ্গে প্রেম আছে তোমার?"

প্রেম? ওর কি প্রেম আছে কারও সঙ্গে? এতদিন পর, কোনও দৃশ্য সম্পর্কের বাইরে থেকেও কি বেঁচে আছে প্রেম? কীভাবে বেঁচে আছে? কী করে সম্ভব এমন বেঁচে থাকা? প্রেম কী তবে? ক্যাকটাস, না তার বুক ফাটিয়ে জেগে থাকা ফুল?

২

রোদ থেমে আছে বিকেলের মাথায়। কমলা রঙের রোদ কালো ছায়া ফেলে ছড়িয়ে আছে চারপাশে। আজ মনটা অন্যদিনের তুলনায় একটু ভাল আছে বোবোর। সাইটের একটা ঝঞ্ঝাট সবে মিটেছে। সর্দার আবার ঠিকমতো কাজ শুরু করেছে। সন্ধের টিফিন আর পনেরো টাকা করে রোজ বাড়িয়ে দিয়েছে বোবো। কী করবে, কাজের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল খুব। সর্দার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছে। বোবো বোঝে ব্যাপারটা। আসলে সর্দার লেবারদের লিড করছে। সে যদি কিছু আদায় না করতে পারে তবে সবার সামনে তো তার সম্মান থাকে না। বোবো পারত, পুরো দলটাকে বসিয়ে দিয়ে নতুন দল আনতে। কিন্তু সেখানেও সাত-দশদিনের ধাক্কা। তাই এই ব্যবস্থাই করেছে। তবে লিখিয়ে নিয়েছে যে, কাজ শেষ হওয়া অবধি যেন আর কোনওরকমের ঝামেলা না হয়।

ঘটনার পর থেকে বোবোর মনটা একটু ভাল হয়েছে। চারদিকে ঝামেলার মধ্যে এই একটা ভাল ঘটনা ঘটেছে। আজ নারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বোবো। নাঙ কীসব কাজ বোঝাচ্ছে বিকাশ আর সাইট এঞ্জিনিয়ারদের। বোবোর আর ভাল লাগছিল না এই সাইট আর তার ঝামেলা। ও একা-একাই বেরিয়ে এসেছে সাইটের বাইরে, এই রাস্তায়।

গণেশ একবার আপত্তি করেছিল। কিন্তু পাত্তা দেয়নি বোবো। সবসময় অমন মালকিন সেজে কসমেটিক জীবনে থাকা ধাতে সয় না ওর।

কলকাতার কাছের মফস্সলগুলোর একটা আলাদা চার্ম আছে। বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়েছে বোবো, কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিবেশ ও আর কোথাও পায়নি। অনেককিছু না থাকার মধ্যেও যতটুকু আছে, তা নিয়েই ভাল থাকতে শেখায় এই মফস্সল শহর।

আশপাশে কয়েকটা দোকান রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বোবোর মতো একজনকে একা এমনভাবে রাস্তায় হাঁটতে দেখে লোকজন তাকাচ্ছে। বোবোর মজা লাগছে বেশ। এসব জায়গা বিশেষ উন্নত নয়। কিন্তু সামনে গঙ্গা, মাঠ আর ফাঁকা জায়গা নিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে। তাই এখানে লাক্সারি লিভিং ভিলেজ বানাচ্ছে ওরা। অনেক দাম এক-একটা ফ্ল্যাট আর ডুপ্লের। তাও বুকিং ভালই চলছে। লোকে আজকাল পালাতে চায় শহর থেকে। এমন দূরত্বে থাকতে চায়, যেখানে শহরের সুবিধেগুলোও পাবে, আবার শহরের চিৎকারও আসবে না। লোকে এই আর্কটিক ভিলেজে অনেক শান্তিতে থাকবে। প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি থাকবে।

আজও পাগলটাকে দেখল বোবো। সেই এক পোশাক। শুধু দাড়ি-গোঁফগুলো আরও কিছুটা ঝুড়ো হয়েছে আর মাথায় টুপিটা নেই। লোকটাকে নিয়ে বোবোর কৌতূহল খুব। আসলে ছোট থেকেই পাগলদের নিয়ে একটা কৌতূহল ছিল বোবোর। ওর মনে হত এরা কারা? কোথা থেকে এরা আসে শহরে? এরা জামা-কাপড় পায় কোথায়? কে খাবার দেয়? কোথায় ঘুমোয় রাতে?

আরও একটু বড় হওয়ার পর শুনত, এরা নাকি ছদ্মবেশী রাজকুমার। শুনত, নেতাজিও নাকি হতে পারে কেউ! আবার কেউ বলত, এরা সব স্পাই। সবার উপর নজর রাখছে। আসলে সেসব নয়, বোবোর মনে হত, এরা পথ ভুলে অন্যমনে চলে যাওয়া মানুষ।

সাইটের সামনে এই মানুষটিকে দেখেও তেমনই মনে হয় বোবোর। কী অদ্ভুত নির্লিপ্ত। কোনও চাহিদা নেই, শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই। মনখারাপ নেই, ডিপ্রেশন নেই। শুধু অদ্ভুত এক আকাশ বহন করে চলেছে যেন বুকের ভিতর। যেন নিজস্ব ছায়াপথে ঘুরে চলেছে আনমনে।

এখানে একটা রিকশা স্ট্যান্ড হয়েছে ক'দিন হল। চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে সেখানে। রিকশাওলারা নিজেদের মধ্যে জটলা করছে। আর পাগল মানুষটি তাদের দিকে আঙুল তুলে কীসব যেন বলছে! রিকশাওলারা অবশ্য পাত্তাই দিচ্ছে না।

বোবোর কৌতূহল হল। ও এদিক-ওদিক দেখে পায়ে-পায়ে ওই লোকটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

শুনল লোকটা বলছে, "পনেরোশো আলোকবর্ষ। ভাবতে পারিস তোরা? কত দূর ভাবতে পারিস? সেখানে আছে আরিয়ন নেবুলা। নব্বই আলোকবর্ষ তার ব্যাস। কত তারা সেখানে জন্মাচ্ছে! কত সৌরমণ্ডল জন্মাচ্ছে! তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবী থেকে ওটাকে চিনির দানার মতো দেখতে হলে কী হবে, ওটা যে কী ভীষণ বড়, ভাবতে পারছিস? আকাশে ওই কালপুরুষের কোমরের মাঝখানে যে-আলোটা তোরা এখন দেখিস, সেটা আসলে পনেরোশো বছরের পুরনো আলো। ওই নেবুলা ধ্বংস হওয়ার পনোরোশো বছর পরও ওই আলো তোরা দেখবি। ভাবতে পারছিস কত বড় ব্যাপারটা? কত বড়? কী বিশাল ওই রাতের আকাশ? ওই হাঁ করে থাকা ব্রহ্মাণ্ড! তার তুলনায় তুই কী? কী তুই? শহরের তুলনায় একটা ব্যাকটেরিয়া? তাও নোস।

তার চেয়েও ছোট। মানে এমন ছোট যে, আসলে তুই নেই। তোর অস্তিত্বও নেই। আর সেই তুই কিনা ঘ্যাম দেখাস সকলকে? হাতে মাথা কাটিস? ক্যামেরার সামনে পোজ দিস? মাইকে বাতেলা করে ময়দান ফাটাস? অন্যকে পোকা-মাকড় বলে মনে করিস! লজ্জা লাগে না তোর? নাকি সেই লজ্জার বোধটাও নেই? কতদিন বাঁচবি তুই? এই জগৎ সংসারের তুলনায় কতদিন আয়ু তোর? শুঁয়োপোকা তো তাও প্রজাপতি হয়! কিন্তু তুই কী হবি? কী হবি তুই?"

রিকশাওলারা পাগলটাকে দেখে হাসছে। নিজেদের মধ্যে বাজে কথাও বলছে। আর তার সঙ্গে বোবোর দিকে একটা অদ্ভুত লালা-মাখা দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছে। পাগলটা কথা শেষ করে হাঁপাল কিছুক্ষণ। তারপর বোবোর দিকে তাকিয়ে দেখল। এগিয়েও এল দু' পা। বোবো একটু ঘাবড়ালেও পিছল না। বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাগলটা এসে বলল, "সাতটাকার নোট দাও তো একটা। আজ চা খেতে ভাল লাগছে না। কফি খাব। আইনস্টাইন কফি খেতেন। ফেইনম্যানও কফি ভালবাসতেন।"

বোবো বলল, "সাতটাকার নোট তো হয় না। দশ টাকার নোট আছে," পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বোবো একটা দশটাকার নোট বাড়িয়ে দিল পাগলটার দিকে। বলল, "এই নাও।"

পাগলটা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল, "ওঃ, বলছি সাতটাকার নোট দিতে, দিচ্ছে দশটাকার নোট! আমার কাছে তিনটাকার নোট নেই এখন। দিতে পারব না। যাও লাগবে না। তোমার পাল্লায় পড়ে কফিটাও খাওয়া হল না।"

বোবোর অবাক মুখের দিকে না তাকিয়ে পাগলটা পায়ে-পায়ে চলে গেল সাইটের পিছনের গেটের দিকে।

বোবো মাথা নাড়ল নিজের মনে। তারপর ওদের বড় কনস্ট্রাকশনটার দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে কোনও দৈত্যর অর্ধেক খাওয়া কেক। পুরো না হলে কোনওকিছু কেমন অদ্ভুত বাজে লাগে! সে জিনিসই বলো আর সম্পর্কই বলো, সম্পূর্ণ না হলে সবই কেমন যেন মনখারাপ করা দেখতে হয়।

ক'টা বাজে এখন? নাঙু এখনও এল না তো! একটা ফোন করবে কি?

ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করা মাত্র রিং হল। ইক্কি। চোয়াল শক্ত হল বোবোর। ছেলেটা আবার কেন ফোন করল? এত বিরক্ত লাগে ওর! বেশ তো ছিল ও, দিদি কেন যে কিউপিড হওয়ার চেষ্টা করে আবার ইক্কিকে ঘাড়ে ঠেলল ওর?

সেদিন দিদির জন্মদিনে ইক্কিকে দেখে অবাক হয়নি বোবো, কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল খুব। তার উপর অমন চিৎকার করে ওসব ছোটলোক-টোক বলে প্রশ্ন করায় বোবোর মনে হচ্ছিল ইক্কির গালে একটা সপাটে চড় মারে। বোবো কোনও উত্তর না দিয়ে কটমট করে তাকিয়েছিল ইক্কির দিকে।

সেদিন ইক্কি এগিয়ে এসেছিল কাছে, "কী হল? কোন ছেলের জন্য তুমি আমায় ইগনোর করছ?"

"আরে," দিদি দাঁড়িয়েছিল দু'জনের মাঝখানে, "ও কিছু না। ওর কলেজলাইফে একটা হাভাতে টাইপের ছেলে ওকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করত।"

"দিদি," বোবো প্রতিবাদ করেছিল, "হাভাতে মানে?"

"আমার কথার উত্তর দাও, কে ছেলেটা? সেই ছেলেটা যার কথা বলেছিলে? সে তো কবে কেটে গিয়েছে। তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করছ তবে?" ইক্কি ভুরু কুঁচকে ছিল।

"তোমায় বলব কেন?" বোবো ইক্কির দিকে তাকিয়েছিল সটান।

"আমাকে জানতে হবে। আমার উড বি ওয়াইফের লাইফ সম্বন্ধে আমায় জানতেই হবে।"

বোবো কোনও উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

ইক্কিও আসত। কিন্তু দিদি ওকে আটকে দিয়েছিল বাইরেই। নাঙু ব্যাপারটা বুঝলেও দুই বোনের ভিতরে আসেনি। আসলে নাঙু বোবোকে নিজে থেকে অনেককিছু বললেও দিদির কাছ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখে। সেদিনও দূর থেকে দেখছিল। বাড়িতে তেমন লোকজন তখনও এসে পৌঁছয়নি। জামাইবাবুও বাড়িতে ছিল না সেই মুহূর্তে। বোবো একাই সোফায় বসে টিভি চালিয়ে দিয়েছিল।

কিছু পর ইক্কি এসে বসেছিল ওর পাশে। বোবো বুঝতে পারছিল যে, দিদি দূরে নাঙুর কাছে গিয়ে বসলেও চোখ স্থির রেখেছিল ওর দিকেই।

ইক্কি নরম গলায় বলেছিল, "আয়্যাম সরি বোবো। সরি ডার্লিং। আসলে মাঝে মাঝে আমি পজেসিভ হয়ে গিয়ে খুব রাগ করি। আমি জানি এসব আমার করা উচিত নয়। আসলে আই লাভ ইউ ভেরি মাচ। তাই কন্ট্রোল লুজ করি। প্লিজ ফর দ্য লাস্ট টাইম, ফরগিভ মি।"

বোবোর বুকের ভিতরটা খুব শুকনো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কতদিন শহরে বৃষ্টি হয় না! মনে হয়েছিল, কবে শেষ জল দেখেছে ও? ভাল লাগছিল না ওই বাড়িতে বসে থাকতে। ইক্কির গা থেকে ভেসে আসা সুগন্ধে গা গুলিয়ে উঠছিল ওর।

ইক্কি ওর শক্ত চওড়া হাতটা দিয়ে চেপে ধরেছিল বোবোর লেবু পাতার মতো করতল। বলেছিল, "ডিয়ার, ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি। আমি তোমার থেকে দূরে থাকলেই কষ্ট পাই। রেগে থাকি। সেই অফিসে ঝামেলার পর তুমি আমার সঙ্গে যেই যোগাযোগ বন্ধ করলে, আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম! আজ তাই মিসবিহেভ করে ফেলেছি। দিদি আমায় সব বলেছে। অল ইজ সর্টেড আউট। শুধু ইন ফিউচার কোনও ছেলের সঙ্গে সিমপ্যাথেটিক হয়েও আর ভাল ব্যবহার কোরো না।"

শেষের কথাটা কট করে কানে লেগেছিল বোবোর। কিন্তু আর কথা বাড়ায়নি। জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল ওর। কষ্টটা বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল একদৌড়ে পালিয়ে যায় কোথাও।

দিদি আর পারেনি দূরে থাকতে। নাঙুর কাছ থেকে উঠে এসে

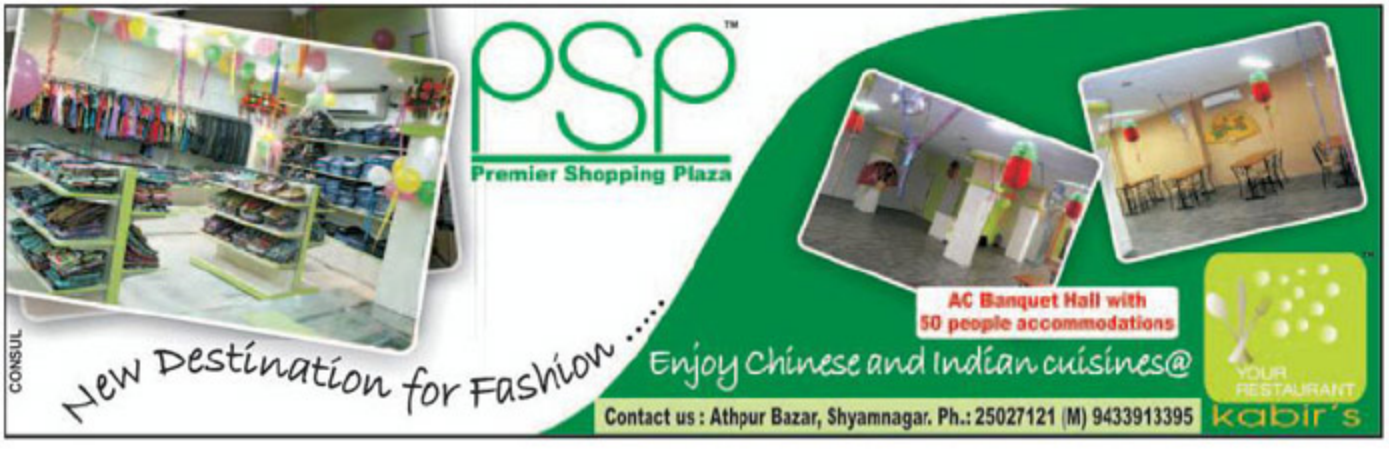

বসেছিল ওর পাশে। বলেছিল, "আর গোঁয়ারতুমি করিস না। ইক্কির কথা শোন।"

তারপর লোকজন আসতে শুরু করেছিল। জামাইবাবুও এসে পড়েছিল অফিস থেকে। আস্তে-আস্তে জমে উঠেছিল আড্ডা, গল্প। বোবোও চেষ্টা করছিল স্বাভাবিক হতে। কিন্তু পারেনি। বুঝেছিল, বৃষ্টি নামবে না সহজে। শহরে বর্ষা আসতে এখনও অনেক দেরি।

"হ্যাঁ, বলো," গলার বিরক্তিটা আজ লুকলো না বোবো।

"কোথায় তুমি?" ইক্কি নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

"এই তো বজবজের সাইটে। কেন?"

ইক্কি বলল, "ভেবেছিলাম তোমায় নিয়ে আজ ডিনারে যাব। তাই কল করে নিলাম। কখন আসছ তুমি? আমি যদি সাতটায় তোমার বাড়ি যাই, তোমায় পিক আপ করতে পারব?"

কী ঝঞ্ঝাট! বোবো ভাবল, কীভাবে কাটানো যায় ওকে। বলল, "না, আমি তো এখন ওই ডোঙারিয়ার জমিটার জন্য নারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে যাব। ওখানে তো মিনিমাম ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। তারপর আবার সাইটে আসতে হবে। সো আই থিঙ্ক টুডে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর মি।"

"নারায়ণ চক্রবর্তী! ওঃ," এবার ইক্কি বিরক্ত হল, "তোমার সেই নাইটমেয়ার প্রজেক্ট! আরে ওই ডেডল্যান্ড নিয়ে কী হবে? কেন মানি ড্রেন করবে ফর সাম ইরিটেটিং ওল্ড এজ হোম অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্ল্যানটেশন. কী জান তুমি ওই প্ল্যানটেশন সম্বন্ধে?"

বোবো বলল, "আমি তার জন্য লোক হায়ার করব। কথাও বলেছি। মসুরি থেকে দু'জন আসবেন এই ব্যাপারে আমায় হেল্প করতে।"

"বোকার মতো কথা বোলো না। ওসব বাদ দাও। নারায়ণ চক্রবর্তী-টর্তী সরিয়ে রাখো। আরে ওয়েস্টেজ অব হার্ড-আর্নড মানি। যেতে হবে না। কাম ব্যাক হোম। উই উইল হ্যাভ আ বল।"

বোবো জানে, আর বেশিকিছু বললে মাথা গরম হয়ে যাবে ওর। এমনিতেই নারায়ণ চক্রবর্তী দেখা করতে চাইছিল না। কোর্ট-কাছারির হুমকি দেওয়ার পর রাজি হয়েছে। সেখানে এমনভাবে ও পিছিয়ে এলে খুব বাজে হবে সেটা। আর সবচেয়ে বড় কথা ইক্কির সঙ্গে কোনওমতেই ও সময় কাটাতে রাজি নয়। কী করে যে ও প্রথম-প্রথম ইক্কির সঙ্গে সময় কাটাত! বিয়ের কথা ওঠায় কীভাবে যে ও নিমরাজি হয়েছিল, ভাবলে আজ ওর নিজেরই অবাক লাগে।

কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে, তা তো গিয়েছেই। সেটা তো আর ও পালটাতে পারবে না। এখন সামনে দেখতে হবে। ইক্কি যে ওকে ভালবাসে না, সেটা বোবো জানে। ইক্কির নজর যে ওর ব্যবসায়, সেটাও ভাল বোঝে। কিন্তু ওকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার মতো এখনও শক্ত কোনও গ্রাউন্ড পাচ্ছে না। একবার যদি কিছু হাতে পায় বোবো যাতে দিদির সারাজীবন ওকে খোঁচা দেওয়া বন্ধ হবে, তবে ও ইক্কিকে সাইড করে দেবে।

বোবো বলল, "সরি ইক্কি, আজ নো চান্স। গট টু গো নাউ। বাই।"

ফোনটা কেটে ওর মনে হল গলা থেকে দড়ির ফাঁস আলগা হল। একবার ঘড়ি দেখল ও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার যাওয়া উচিত।

"কী রে? তোকে আমি ভিতরে খুঁজছি আর তুই বাইরে দাঁড়িয়ে কী করছিস?"

নাঙুর গলা পেয়ে তাকাল বোবো। বলল, "কেন তোমায় তো বললাম, আমি বাইরে থাকব। তুমি না সত্যি বুড়ো হচ্ছ!"

নাঙু বলল, "আর তুই পাগলি হচ্ছিস। কী হয়েছে তোর বোবো? আজকাল কী হয়েছে তোর? লাস্ট কাপল অফ মান্থস দেখছি, তুই যেন কেমন করছিস! ব্যাপারটা কী?"

বোবো হাসল, "তুমিও সকলের মতো বলছ? বাদ দাও। চলো, এবার যেতে হবে।"

"কোথায় যাবি? জীবন সংগ্রাম না কে ওই লরেল-হার্ডি টাইপ দু'টো ফোন করে বলল যে, নারায়ণবাবুর নাকি খুব শরীর খারাপ। আজ দেখা হবে না। ডাক্তার এসেছে। আমাদের অন্যদিন যেতে হবে।"

"কী শরীর খারাপ? আর তোমায় ফোন করল কেন? আমায় করেনি কেন?"

"আরে তুই মালকিন মানুষ। এত বড় ব্যবসার কর্ণধার। তোকে যে-কেউ ফোন করতে পারে?" নাঙু হাসল।

বোবো নাঙুর কথা শুনে মাথা নিচু করে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর মোবাইল বের করে নম্বর ডায়াল করল একটা। বলল, "গণেশ গাড়ি নিয়ে মেন গেটের সামনে এসো। আমাদের যেতে হবে।"

"গণেশ মানে? কোথায় যাবি?" নাঙু অবাক হল।

বোবো দেখল মেন গেট দিয়ে বড় কালো গাড়িটা বেরিয়ে আসছে। ও সেদিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "যাই, নারায়ণ চক্রবর্তীর শরীর কতটা খারাপ দেখে আসি।"

"বোবো, সেটা বেশি হয়ে যাবে না?" নাঙু ইতস্তত করল।

বোবো স্থির গলায় বলল, "আমি কোনওদিনই যতটা করার, ততটা করিনি। কিন্তু এবার থেকে ভাবছি করব। তাতে যদি বেশি হয়, হবে। জান নাঙু, ক্যাকটাসে সহজে ফুল হয় না, কিন্তু যখন হয়, ফাটিয়ে হয়। দেখা যাক, আমার ক্যাকটাসের জোর কতটা।"

৩

নাঙুর ঘর থেকে বেরিয়ে লনে পা দিয়ে নিজেকে শান্ত করল বোবো। ইক্কি এমনটা করতে পারল! কথাটা শোনার সময় ও যদি ইক্কিকে ধরতে পারত, তবে কী যে করত নিজেই জানে না। এই মানুষ! একে বিশ্বাস করতে হবে সারা জীবন? এর সঙ্গে থাকতে হবে? কিন্তু তবু নিজেকে সামলাতে হবে। নিজেকে সামলানো দরকার। প্রথমে ছিল মা, এখন দিদি, এদের কথায় ও নিজের দিকটা দ্যাখেনি এতদিন। কিন্তু এবার মাথা ঠিক করে বুঝতে হবে ও কী চায়! ওর জীবনটা কীভাবে কাটাতে চায়?

লনে বেরিয়ে পায়ের পাতলা স্লিপারটা খুলে ফেলল বোবো। গত পরশু থেকে পায়ের একটা ফোসকা ভোগাচ্ছে। একটা জুতো কিনেছিল ও। অনেক দাম দিয়েই কিনেছিল, কিন্তু সেটা পরে যে এমন ফোসকা পড়বে সেটা বুঝতে পারেনি। স্লিপারের স্ট্র্যাপটা যেখানে থাকে সেখানেই ফোসকা পড়েছে। জুতোটা খুলে হাতে নিয়ে পা-টা ঘাসের উপর রাখল বোবো। অনেকদিন পর ঘাসে পা রাখল ও। লনটা নতুন করিয়েছে। সব ঘাস তুলে আবার নতুন করে ঘাস বুনিয়েছে মালি দিয়ে। ঘাসগুলো বেশ নরম আর সবুজ। পা রেখে ভাল লাগল বোবোর। মাথা গরমটা একটু না কমা অবধি ও ঘরে যাবে না।

আজ রবিবার। ছুটি। তবে সকালে একবার বেরিয়ে টেক্সটাইলে গিয়েছিল। বয়লারটা গন্ডগোল করছে। তাই যেতে হয়েছিল ওখানে। ফলে ফিরতে দুপুর হয়েছে। নাঙুও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বোবোই বারণ করেছে। নাঙুর বয়স বাড়ছে। তা ছাড়া, লো প্রেশারে ভোগে। কয়েকদিন আগে তো মাথা ঘুরে গিয়েছিল। নেহাত বোবো আছে, না হলে এই বয়সে নাঙুকে কে দেখত!

নাঙু একটা অদ্ভুত মানুষ! এতটা নির্লিপ্ত আর লোভহীন কাউকে ও দ্যাখেনি। যা খাটনি, যা রোজগারের চেষ্টা, ব্যবসা বড় করার চেষ্টা সবটা করে বোবোর জন্য। নিজে কখনও কিছু দাবি করে না। বোবো নিজে থেকে দামি কিছু কিনে দিলেও নেয় না। খুব সাধারণ পোশাক-আশাক, সামান্য আর নিরামিষ খাবার খেয়ে বেঁচে আছে লোকটা। শখ বলতে গান শোনা। তবে সেটাতেও খুব বেশি খরচ না করে সাধারণ মিউজিক সিস্টেমই ব্যবহার করে।

কেন বিয়ে করেনি নাঙু? বোবো বহুবার জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু প্রতিবারই নাঙু হাসিমুখে ভুলভাল উত্তর দিয়েছে। আসল কথাটা বলেইনি। কী লুকোতে চায় লোকটা? কাকে লুকোতে চায়? কার জন্য সারাজীবন এমন হয়ে থাকল নাঙু? প্রেমের জন্য? এই সারাজীবন কি একজনকেই ভালবাসল? এমন প্রেম কি সত্যি হয়? সত্যিই কি কেউ একজনকে ভালবেসে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে?

"পারে, সত্যি ভালবাসলে মানুষ পারে," সম বলত।

বোবো বিশ্বাস করত না। পালটা বলত, "বাজে কথা বলিস না। ছেলেদের ভাল করে চিনি আমি। আজ একে তো কাল ওকে। প্রথমে সবার কাছে গিয়েই নিজের দুঃখের কথা বলে সিমপ্যাথি গেন করে, তারপর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। আমি সব জানি।"

"সবাই নয় রে," সম ওকে বোঝাবার চেষ্টা করত, "হয়তো ছেলেরা ন্যাচার‍্যালি পলিগ্যামস, কিন্তু সবাই অমন নয়। আমিই তো নই।"

"আর গুল দিতে হবে না," রাগ করত বোবো, "কলেজের ওই বোটানির গরিমা যখন এসে তোর সঙ্গে কথা বলে, তখন তো একদম গলে জল হয়ে ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাস।"

"বাজে কথা। আমি ভদ্রতা করি মাত্র। আমি শুধু তোকেই ভালবাসি। আর-কাউকে নয়। আর কাউকে দেখে আমি নিজের মনে করতেই পারি না। আর কারও সঙ্গে নিজেকে কানেক্টেড মনে করতে পারি না।"

বোবো রাগ রাগ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও, মনের ভিতরে একটা গোলাপি নদীর স্রোত টের পেত। মনে হত, বড় একটা মাঠ আছে সেই নদীটার পাশে। আর সেখানে অনেক-অনেক প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় সারাদিন।

বোবো বলত, "তাই? আর আমার মা যদি তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি না হয়? তবে?"

"তবে?" সম তাকাত ওর দিকে, বলত, "তবে আমি কোনওদিন বিয়েই করব না। কোনওদিন বিয়ে করব না। তোকে ছাড়া আমি তো কারও নই। শুধু..."

"কী শুধু?"

"শুধু তোকে যখন অন্য ছেলে প্রথম ছোঁবে, জানবি সেদিনটাই আমার মৃত্যুদিন হবে।"

"নাটক না? খুব নাটক করতে শিখেছিস!" আর মিথ্যে বলতে হবে না। আমি বিশ্বাসই করি না," বোবো হাসতে-হাসতে চুল ঘেঁটে দিত সমর।

সম মুখ নিচু করে বসে থাকত। বোবো তাকিয়ে দেখত ওর ফরসা মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে। বড় আর পাতলা কানের শিরা-উপশিরা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। অস্পষ্ট একটা নদী এখন নিজের ভিতর টের পায় বোবো। মনে হয়, এখন কোথায় সম? কার সামনে অমন করে বসে থাকে? ও কি ভুলে গিয়েছে কী বলেছিল?

ঘাসের উপর বসল বোবো। বিকেলের রোদটা এখন নরম হয়ে গিয়েছে। একটা ঘোলাটে কমলা আলো নেমে আসছে আকাশের বাটি গড়িয়ে। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। ইউক্যালিপটাস আর বাদাম গাছের মাথা ডিঙিয়ে বোবোকে ছুঁয়ে হাওয়া কোথায় যাচ্ছে? কার কাছে যাচ্ছে?

"কী হয়েছে তোর?" নিনি এসে দাঁড়াল সামনে। হাতে ওর মোবাইল।

"কেন? কী হবে?" বোবো পালটা জিজ্ঞেস করল।

"এমন করে মাঠে বসে রয়েছিস কেন? কী হয়েছে তোর?"

বোবো মাথা নাড়ল, "কিছু হয়নি নিনি। জাস্ট এমনি বসে আছি। কী হবে? আগে এখানে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম, মনে আছে? তুমিও তো খেলতে।"

নিনিও পাশে বসল, "তা মনে আছে। তখন তো বাড়িটা ভরে থাকত। আর এখন তো মৃত্যুপুরী! আচ্ছা, তোর সঙ্গে ইক্কির বিয়ে হয়ে গেলে তুই যখন ও বাড়িতে চলে যাবি, তখন এখানে কী হবে?"

বোবো নিনির দিকে তাকাল একবার। বলল, "তোমার ইক্কিকে কেমন লাগে?"

"আমার?" নিনি ঘাবড়ে গেল, "কেন এমন বলছিস? কী লাগবে?"

"ইক্কিকে কেমন লাগে তোমার, এই সহজ প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারছ না?"

নিনি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "তোর ওকে পছন্দ নয়, না?"

"তোমার সমকে মনে আছে?"

"সম?" নিনি অবাক হল একটু, তারপর সামলে নিয়ে বলল, "ও মনে পড়েছে। সেই সুন্দর আর দুঃখী চোখের ছেলেটা? হঠাৎ তার কথা কেন?"

"না, এমনি..." বোবো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিনি বলল, "যা বলতে এলাম, ইক্কি তোকে ফোন করেছিল। তিনটে মোবাইলেই রিং হয়ে যাচ্ছে দেখে ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছিল। বলছে তোকে কল করে নিতে।"

কথাটা বলে নিনি হাতের মোবাইলটা বোবোর কোলে রাখল।

বোবো বলল, "শোনো, ও যদি আবার ফোন করে, তা হলে বলবে আমি ফোন না নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।"

নিনি কথাটা শুনেই চিড়বিড় করে উঠল, "ও আমি পারব না। তোদের মধ্যে মাঝে-মধ্যেই এমন ঝগড়া হবে, আর তোদের রাগ-অভিমান চলবে, এসব আমার ভাল লাগে না মোটেই।"

"আচ্ছা," বোবো উঠে পড়ল, "তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেই বলব।"

নিনিও উঠল, "আমি পারছি না বাবু তোমায় নিয়ে। যাকে বিয়ে করবে তার সঙ্গে এত রাগ কীসের?"

বোবো আর কথা না বলে মূল বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মাথাটা আবার গরম হচ্ছে। ইক্কি একটা উপদ্রবের নাম। আর সেটা এখন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে। আসলে সবকিছুই যেন কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছে। ইক্কি, বিজনেস, জমি... সব।

নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে সেদিন জোর করেই গিয়েছিল বোবো।

SVKM's
NMIMS
Deemed-to-be University

We don't just deliver outstanding programs. We also develop successful leaders.

NMIMS is a 31-year old institution with a reputation of being India's premier Business School. Academic excellence coupled with experiential pedagogy has enabled us to transform from being a top B-School to a Deemed-to-be University.

NMIMS today is a sought-after name for careers in Engineering, Pharmacy, Commerce, Science, Architecture and Economics.

NMIMS Schools

• School of Business Management • Shobhaben Pratapbhai School of Pharmacy & Technology Management • Mukesh Patel School of Technology Management & Engineering • Balwant Sheth School of Architecture • Anil Surendra Modi School of Commerce • Sarla Anil Modi School of Economics • School of Science • NMIMS Global Access (SDL) • Academy of Aviation

NMIMS Programs

Management	: MBA, PGDM, Part-Time MBA, Executive & Ph.D. programs.
Pharmacy	: B.Pharm., MBA Pharma Tech., B.Sc.+ M.Sc., M.Pharm., B.Sc.(Hons.), M.Sc. (Applied Pharm. Sciences), M.Pharm.+MBA, B.Pharm.+M.Pharm. and Ph.D.
Engineering	: B.Tech., MBA (Tech.), MCA, M.Tech. and Ph.D.
Architecture	: B.Arch.
Economics	: B.Sc. (Economics)
Science	: Integrated M.Sc. & Ph.D., M.Sc. and Ph.D.
Commerce	: BBA & B.Com. (Hons.)
Distance Learning	: One & Two year Diploma programs in Management

Business Management
Engineering
Pharmacy
Architecture
Commerce
Science
Economics

SVKM's
Narsee Monjee Institute of Management Studies
(Deemed-to-be University since 2003)
e-mail: nmims@nmims.edu • Tel: 91-22-4235 5555/ 26183688 • www.nmims.edu
Mumbai | Shirpur | Bengaluru | Hyderabad

নাঙুর নিষেধ সে শোনেনি। অবশ্য গিয়ে তেমন সুবিধেও কিছু হয়নি। বাড়ির সামনেই জীবন আর সংগ্রাম, দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওদের দেখে সংগ্রাম টুক করে ঢুকে গিয়েছিল বাড়ির ভিতরে। আর জীবন পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "এ কী, আপনারা? জামাইবাবুর শরীর খারাপ জানেন না? দেখা হওয়া সম্ভব নয়।"

বোবো চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "অমন শরীর সবারই খারাপ হয়। কোর্টের পেপার দেখলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"মানে? জানেন আপনি কাকে কী কথা বলছেন?" জীবন তেরিয়া হয়ে উঠেছিল।

বোবো ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "আমি নিয়ম জানি। আর সেটাই শেষ কথা।"

জীবন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সংগ্রাম এসে দাঁড়িয়েছিল এবার। আশ্চর্য অমায়িক গলায় বলেছিল, "আপনারা ভিতরে আসুন। জামাইবাবু খুব অসুস্থ, কিন্তু আপনারা বলেই কথা বলতে রাজি হয়েছেন।"

বোবো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নাঙু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, "চলুন।"

ঘরের ভিতরের জানালাগুলো সব বন্ধ। চায়ের লিকারের রঙের একটা আলো চুঁইয়ে আসছিল জানালা দিয়ে। তার ভিতর একটা চৌকিতে শুয়েছিল নারায়ণ চক্রবর্তী।

বোবো সামনে বসে সময় নষ্ট করেনি। বলেছিল, "আমি ডাইরেক্ট পয়েন্টে আসছি। দেখুন নারায়ণবাবু, অনেকদিন হল জমিটা ঝুলে আছে। দু'লাখ টাকাটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল আমি ঠিক করেছি যে, আর দেরি না করে আমি ওই জমিতে কাজটা শুরু করব। আপনি বলুন, কবে জমিটা আমাদের দেবেন?"

নারায়ণ বলেছিল, "আর বলবেন না। আমার মেজ ভাইয়ের ছেলেটা এত ঝামেলা করছে! ওদেরও তো একটা ভাগ আছে জমিতে। আমারই দেওয়া জমি আর এখন আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে! ব্যাটা আমায় ঝোলাচ্ছে। বলছে অনেক টাকা লাগবে। বাড়িতে খুব কোন্দল শুরু হয়েছে। তাই বলছিলাম, ভাইয়ে-ভাইয়ে লাঠালাঠি হবে সেটা কি আপনি চান? তার চেয়ে আমি আপনাকে দু' লাখ টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমায় ছেড়ে দিন।"

"ছেড়ে দেব? কনট্র্যাক্ট ভুলে গেলেন?" বোবো কড়া হয়েছিল।

"না, না," খুব কষ্ট হচ্ছে এমন গলায় নারায়ণ বলেছিল, "কিন্তু মানুষ তো সবার উপরে। তাই বলছিলাম, যদি প্লিজ ছেড়ে দেন।"

নাঙু বোবোকে হাত দিয়ে চুপ করতে বলে বলেছিল, "আপনি কি অন্য-কোনও বেটার অফার পেয়েছেন নারায়ণবাবু?"

"না, না," নারায়ণের গলার স্বরটা পালটে গিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। বলেছিল, "কী যে বলেন! আমার ব্যক্তিগত সমস্যার কথাই বলছিলাম। যদি একটু বিবেচনা করেন।"

বোবো তাও ছেড়ে দেয়নি, বলেছিল, "আমি কি আপনার মেজ ভাই বা ছেলের সঙ্গে কথা বলব?"

"না, না, একদম না," নারায়ণ চক্রবর্তী, যাকে এতক্ষণ মৃতপ্রায় দেখাচ্ছিল, এই কথাটা বলার সময় এমন করে উঠে বসেছিল যেন সাত হাতির বল এসে গিয়েছে শরীরে, "ওরা খুব খারাপ মানুষ। ছেলেটা তো কুলাঙ্গার। কলকাতায় মামার সম্পত্তি গাপ করে বসে আছে। এখন আমাদের সঙ্গে লেগেছে। চাপ দিয়ে যতটা আদায় করে নিতে পারে! কিন্তু আমরা অহিংসার পক্ষে। তাই কিছু করব না। জমি আর বিক্রি করব না। আপনি সদয় হোন একটু। আপনারা বড় মানুষ, এমন কত জমি পাবেন! যদি আমাদের ছেড়ে দেন, তবে পারিবারিক কোন্দল থেকে মুক্তি পাই।"

নাঙু বলেছিল, "আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।"

বোবোরা আর বসেনি। বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। বাড়ির সামনে অনেকটা বড় মাঠ। গাড়িটা সেই মাঠেই রাখা ছিল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল বোবো। একটা মেয়ে আর একজন

বয়স্ক লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সেসময়। তাদের দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল বোবো। ভদ্রলোককে চেনা মনে হচ্ছিল ওর। কোথাও দেখেছি কি? বোবো গাড়ির দরজা খুলে উঠতে গিয়েও থমকে আর-একবার মুখ ফিরিয়ে দেখেছিল। এত চেনা কেন মনে হচ্ছে? নাকি ওর মনের ভুল? কিন্তু এতটা মনের ভুল? কী জানি!

গাড়িতে বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বোবো। তবে নাঙুর কথায় আবার মন দিয়েছিল নারায়ণ চক্রবর্তীর সমস্যায়।

নাঙু বলেছিল, "কী রে, কী বুঝলি? আমার মনে হচ্ছে তোর আসাটা উচিত হয়নি। এতে তোর পজিশন একটু ডাইলিউটেড হয়ে গেল।"

বোবো সামান্য চিন্তা করেছিল। তারপর বলেছিল, "আচ্ছা নাঙু, বিকাশ তো কলকাতার ছেলে। কিন্তু ও কি সেখান থেকেই যাতায়াত করে নাকি এখানেই কোথাও থাকে?"

নাঙু অবাক হয়ে বলেছিল, "কেন? বিকাশ এখন এখানেই থাকে। রোজ যাতায়াত করে না। উইকএন্ডে বাড়ি যায়।

বোবো বলেছিল, "তুমি বিকাশকে বলো ওই জীবন বা সংগ্রাম ওদের সঙ্গে যেন মিশে জানতে চেষ্টা করে কে নারায়ণ চক্রবর্তীকে বেশি টাকা দিচ্ছে। কিন্তু গোপনে জানতে বোলো।"

নাঙু হেসেছিল, "তুই বুঝতে পেরেছিস?"

বোবো বলেছিল, "সত্যিকে অমন জোর দিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বলার দরকার পড়ে না। এর পিছনে যে কেউ আছে, তা তো আবছা শুনেইছিলাম। কিন্তু আজ জানতে পারলাম স্পষ্ট।"

বিকাশ পেরেছে। বোবো ভেবেছিল সময় লাগবে। কিন্তু বিকাশ যে এমন করিতকর্মা বুঝতে পারেনি। জীবন লোকটার পেটে কিছুটা মদ পড়ামাত্রই সে গড়গড় করে বলে দিয়েছে সব। আজই বিকাশ দুপুরে ফোন করে জানিয়েছে নাঙুকে। বিকেলে সেটাই নাঙুর থেকে জেনেছে বোবো।

ইক্কি! গোটা ঘটনার পিছনে আছে ইকজ্যোৎ! বোবো বুঝতে পারছে এখন। কেন প্রথম থেকে জমিটা থেকে বোবোকে সরে যেতে বলছে ও। ইক্কি ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সেটা যে শুধুমাত্র সম্পত্তির জন্য সেটা এখন আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইক্কিরাও এই কনস্ট্রাকশনে আসতে চায়। আর বোবোদের আর্কটিক ভিলেজের কাছে জমি কিনে বোবোদেরই কম্পিটিশনে ফেলতে চায়। কী সাংঘাতিক ছেলে! এ আবার নাকি ভালবাসার কথা বলে? কোন মুখে বলে?

বোবোকে যেমন ইক্কি বলেছে একদিক থেকে জমিটা ফালতু, জমিটা ছেড়ে দিতে, তেমনই নারায়ণকে অন্যদিকে টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে ধরেছে পিছনে। ইক্কি জানে, বোবো জমিটা নিয়ে ব্যবসা করবে না। এটা ওর নিজের একটা স্বপ্ন। কিন্তু তার কোনও দাম নেই ইক্কির কাছে। ভালবাসলে, সেই ভালবাসার মানুষের স্বপ্নের তো একটা দাম থাকবে! কিন্তু ইক্কি কী করল!

মাথাটা গরম হয়েছিল খুব। কিন্তু বোবো বুঝেছে যে, রাগ কন্ট্রোল না করতে পারলে সবসময় অনিষ্টই হয়। আসলে রাগ একটা শক্তি, এনার্জি। এটার ভুল ব্যবহার যেমন ক্ষতি ডেকে আনে, তেমনই ঠিক ব্যবহার জীবনকে নির্দিষ্ট দিশা দেয়।

রাগ করে ভুলভাল কিছু করে ফেললে সেটাতে ইক্কির সুবিধেই হবে। ইক্কি ওদের ভিতরে ঢুকে ব্যবসার ক্ষতি করতে চাইছে। প্রথমে টেন্ডারটাইলে শার্ট তৈরিতে সাহায্য চেয়ে। আর এখন বোবোর থেকে ওই জমির সম্বন্ধে সব জেনে তলায়-তলায় সেটাকে হাতাতে চেয়ে। বোবোরা ওকে যে বিশ্বাস করেছিল, সেটার কোনও দাম দেয়নি ইক্কি। বরং ছুরি মেরেছে পিছন থেকে। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ অনেক হয়েছে। কিন্তু মেঘ কেটে গিয়েছে এখন। আকাশ পরিষ্কার। শত্রুকে চিনতে বাধা নেই। নারায়ণ চক্রবর্তীর ব্যবস্থা পরে নেবে। আগে ইক্কিকে দেখতে হবে। ওকে ওর জায়গাটা দেখাতে হবে।

লন থেকে লাল মোরামের ছোট্ট পথটা পার করে বাড়ির বারান্দায় সিঁড়িতে পা রাখল বোবো। আর ঠিক তখনই হাতের ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা দেখল, ইক্কি কলিং। নিজের রাগটাকে সংযত করল বোবো। রাগ একটা শক্তি। তার সংযত ব্যবহার মানুষের ধ্বনাত্মক অগ্রগতির সহায়ক। বোবো চোখ বন্ধ করে, শ্বাস ঠিক করল। তারপর ফোনটার স্ক্রিনে বুড়ো আঙুল সোয়াইপ করে কানে লাগাল। শান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ ইকজ্যোৎ, বলো।"

৪

পাগল হাওয়ার দিন আজ। সকাল থেকেই হাওয়া দিচ্ছে খুব। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বৈশাখের এই প্রচণ্ড গরমেও তেমন কষ্ট হচ্ছে না আজ। গাড়ি করে আসার পথে বোবো দেখেছে গাছপালাদের উদ্দাম রকসঙ্গীত। এখন, এই ছাদে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছে বড়-বড় গাছগুলো কেমন নুয়ে পড়ছে হাওয়ায়। ছোট করে কাটা চুলের ফাঁকে দু'হাত ডুবিয়ে চোখটা বন্ধ করে দাঁড়াল বোবো। আজ ক্লান্ত লাগছে খুব। কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। নাঙু বলেছিল যাতে আজ আর এই বজবজে না আসে ও। কিন্তু বোবো তাও এসেছে। আসলে এখানে ওর এত ঘনঘন আসার দরকার পড়ে না। তবু আসে। এই বিশাল জায়গা। নির্জন বিকেল। দূরের মাঠ। একাকিত্ব। খুব টানে ওকে। আর সবচেয়ে বেশি টানে দোতলার এই ছাদটা থেকে দেখা ওই দূরের নদীর পাড়টা।

"নদী। জানিস আমি নদীর পাড়ের ছেলে। আমার শরীরে নদী বয়," খুব বলত সম। আক্রা আর নুঙ্গির মাঝে ঝিনুকবাঁক নামে একটা জায়গায় থাকত ওরা। ওদের ভাড়া বাড়িটা নাকি ছিল নদীর পাড়ে! বাড়ির বারান্দার সামনে কালো পিচের রাস্তা। আর সেটা পেরোলেই সবুজ ঢালু নদীর পাড়ের শুরু।

সম বলত, "তুই যখন গিয়ে থাকবি, বুঝবি নদীর পাশে থাকার কত আনন্দ!"

"আমি থাকব?" বোবো জিজ্ঞেস করত।

"হ্যাঁ তো। আমায় বিয়ে করলে আমাদের বাড়িতেই তো গিয়ে থাকবি!"

"তাই?" বোবো হাসত। বলত, "আর যদি বিয়ে না হয়?"

সম থমকে যেত এই কথাতে। ওর বড়-বড় চোখগুলো ছলছল করে উঠত নিমেষে। মুখটা লাল হয়ে যেত। ও বলত, "তোকে ছাড়া যে আমি আর কারও হতে পারব না বোবো? তুই আমায় না নিলে আমি একাই থাকব যে। আমি আর আমার নদী। কিন্তু আমায় অমন একা রাখতে তোর কষ্ট হবে না?"

"আর কাব্য করতে হবে না," বোবো চিমটি কাটত ওর হাতে। বলত, "খুব কথা জানিস তো! মেয়েদের মাথা খেতে ওস্তাদ একদম। এমন করে বললে আমি কিন্তু বিশ্বাস করে ফেলব।"

সম মাথা নামিয়ে নিত তখন। অস্ফুটে বলত, "দেখিস, আমি তোর থাকি কি না।"

বোবোও তাকিয়ে থাকত সম-র দিকে। তারপর পাপড়ি খসার শব্দে বলত, "জানবি তুই আমার। যদি অন্য-কোনও মেয়ের দিকে কখনও তাকাস, দেখবি আমি ঠিক মরে যাব। জানবি তোর নিজের উপর কোনও অধিকার নেই। বুঝেছিস?"

পাগল হওয়ার দিন ছিল সেসব। আর আজ, পাগল হাওয়ার দিন। ওই দূরে চলে যাওয়া নদী। এখান থেকে আক্রা কতদূরে? এই নদী তো সমদের ওই বারান্দাটা ছুঁয়েই এসেছে। ছুঁয়ে এসেছে ওর ছেলেবেলা। ওর বড় হয়ে ওঠা। একা হয়ে যাওয়ার সমস্ত সময়। এই নদী তো বয়ে যায় সমর শরীরে। তাই কি এটা এত ভাল লাগে ওর? নদীর জল ছুঁয়ে ভেসে আসা হাওয়ায় কি তাই ও পায় সমকে? এখনও পাচ্ছে সম-র গন্ধ?

ছোট করে কাটা চুলের ফাঁকে দু'হাত ডুবিয়ে লম্বা শ্বাস টানল বোবো। তারপর মাথাটা ঝাঁকাল একটু। আজকাল পুরনো কথাগুলো খুব মনে আসে। কেন আসে? বোবোর কোনও বন্ধু নেই বলে? কারও

সঙ্গে সময় কাটাতে পারে না বলে? ইক্কির মতো একটা বিচ্ছিরি মানুষের সংস্পর্শে ছিল বলে? নাকি ও নিজেকে সবার থেকে সরিয়ে নিয়েছে বলে? কেন এমন পুরনো কথা আজকাল মনে আসে বোবোর? আচ্ছা, যার কথা মনে আসে এত, সে কি একবারও ভাবে ওর কথা?

মা মারা যাওয়ার পর দু'-একবার বোবোর মনে হয়েছিল ওই ঝিনুকবাঁক বলে জায়গাটায় যায়। গিয়ে একবার খোঁজে ওকে। হাতে ধরে ওকে বুঝিয়ে বলে, কেন এমন সব হল? কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গিয়েছিল ওই চোখদু'টো। সবার সামনে অপমানিত দু'টো চোখ। সাহস হয়নি বোবোর। নিরপরাধ অথচ শাস্তি পাওয়া মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো সাহস বোবোর নেই।

"ম্যাডাম," পিছন থেকে ডাকল তপন। লোকটা ওভারশিয়ার।

"কী হল?" বোবো পিছন ঘুরল।

"নারায়ণ চক্রবর্তী বলে একজন লোক নীচে অফিসে ফোন করেছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মানে আপনার মোবাইলে ফোন করেছিল, কিন্তু পাচ্ছে না। স্যারকেও ফোন করেছে, কিন্তু স্যারও ধরছেন না।"

বোবো হাসল মনে-মনে। ওষুধ ধরেছে তা হলে। কিন্তু তাই বলে এখনই ফোনে লোকটার সঙ্গে কথা বলবে না।

বোবো বলল, "নাঙুকে ফোন করেছে কেন? লোকটাকে বলো আমাদের হেড অফিসে ফোন করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলতে। কোথাকার কে এক উটকো লোক বার-বার আমার মোবাইলে ফোন করে কেন? বলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলে ওর যা বলার তা বলতে। আমায় যেন ডিস্টার্ব না করে।"

তপন দ্বিধার সঙ্গে বলল, "আমি তাই বলেছিলাম ম্যাডাম। কিন্তু বলল খুব আর্জেন্ট। জমি নিয়ে কথা বলতে চায়। যত তাড়াতাড়ি পারে ও নাকি জমিটা বিক্রি করার ফর্মালিটিটা শেষ করতে চায়। কাউকে না পেয়ে আমাকেই বলল আপনাকে খবরটা পৌঁছে দিতে। আর বলল আমরা যেন ওর মেজ ভাইকে বুঝিয়ে তার ভাগটা কিনে নিই। নারায়ণবাবু আর দেরি করতে চাইছে না।"

"তোমাকে এত কথা বলল?" বোবো হাসল সামান্য।

"হ্যাঁ ম্যাডাম," তপন আমতা-আমতা করল, "আমি বললাম, এসব আমায় বলে লাভ নেই, তবু বলল। কারও সঙ্গে নাকি যোগাযোগ করতে পারছে না, তাই আমাকেই বলল। আরও জানতে চাইল, সাইটে কবে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?"

মনে-মনে হাসল বোবো। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। বোবো যা কোনওদিন করে না, তা এই জমিটার জন্য করেছে। ও নিজে নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়েছিল। তখন ভ্যানতারা করছিল লোকটা। আর এখন নিজেই হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু বোবো সহজে ছাড়বে না। জমিটা তো নেবেই, কিন্তু নারায়ণকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যাবে বার-বার। ওর সঙ্গে শয়তানি করার পরিণামে যত পারে হয়রান করবে।

আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি বোবো যে, কেন এতগুলো বছর ও মনে-মনে বাঁচিয়ে রেখেছিল এই আয়ুর্বেদিক প্ল্যান্টেশন আর ওল্ড এজ হোমের ইচ্ছেটা। আসলে এটার মধ্যে দিয়ে ও নিজেকে কোথায় যেন যুক্ত করে রাখত সমর সঙ্গে। কারণ সেই কলেজজীবনে এমন একটা ইচ্ছে তো মনে-মনে নিয়ে ঘুরত সম-ই।

খুব অবাক লাগত বোবোর। বলত, "কী করবি? ওল্ড এজ হোম? আয়ুর্বেদিক প্ল্যান্টেশন! কেন এগুলো কি কম আছে দেশে?"

সম শান্ত গলায় বলত, "না তা নয়। তবে আমি আমার মতো করে করব। আমার মায়ের বাবা মানে দাদুকে শেষ বয়সটা এমন একটা হোমে থাকতে হয়েছিল। ঠাকুরদার মতো দাদুও ছিলেন বৈদ্যরাজ। কিন্তু চোখটা নষ্ট হওয়ার পর দাদুর সব গেল। বাবার তো রোজগার ছিল না বেশি। তাই শ্বশুরমশাইকে হেল্প করতে পারেনি বিশেষ। অবশ্য দাদু হেল্প নিতও না। মামাও তখন বিদেশে ছিল। তাই একটা ওল্ড এজ হোমেই ছিল দাদু। হাজারবার বলা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে

থাকেনি। আমি দেখেছি, কী অবহেলায় দাদুর দিন কাটত ওখানে। তাই ভাবি কোনওদিন পারলে একটা এমন ওল্ড এজ হোম করব যেখানে কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। আর তার পাশেই একটা মেডিসিন্যাল গাছ-গাছড়ার প্ল্যান্টেশন করব। সবটা নিয়ে একটা তপোবনের মতো পরিবেশ তৈরি হবে। সত্যি বলছি, দেখিস, আমি ঠিক করব। কত লোক সেখানে কাজ করবে। লোকের হেল্পও হল, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটও করলাম।"

কত বয়স তখন ছিল ওদের? মাত্র কলেজের ফার্স্ট ইয়ার। বোবোর খুব উদ্ভট লাগত কথাগুলো। মনে হত, কীসব হাবিজাবি বলছে। বলতও তো, "সবসময় মাথায় তোর পোকা নড়ে, না? খালি পাগলের মতো আইডিয়া!"

সম বলত, "সমস্ত নতুন আইডিয়াকেই প্রথমে পাগলের মতো মনে হয়। কিন্তু পরে সেটা ঠিকঠাক কাজে ফলাতে পারলে লোকে জিনিয়াস বলে। রিস্ক বা পাগলামি ছাড়া নতুন কিছু বা বড় কিছু করা সম্ভব নয়। গাড়ি, বাড়ি আর বড় চাকরির চক্করে থাকলে ওসব হবে হয়তো, কিন্তু বাঁচাটা হবে না।"

বোবো কিছু বলত না। হাসত শুধু।

কিন্তু সম চলে যাওয়ার পর ওর বলে যাওয়া কথাগুলো কেমন ঘুরে বেড়াত মাথায়। মনে হত, সম যা ভাবত সেটা যদি ও করে। যদি ও অমন একটা প্রজেক্ট নেয়! বিদেশ থেকে পাশ করে এসে ব্যবসায় ঢুকলেও কাজ শিখতেই বোবোর চলে গিয়েছিল দু'টো বছর। তা ছাড়া টাকা-পয়সাও সব থাকত না ওর হাতে। তারপর যখন গোটা ব্যবসার ভার হাতে এসে পড়ল, তখন অন্যান্য কাজের ভেতরে এই ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিল বোবো। আর তারপর যখন নারায়ণ চক্রবর্তীর এই জমিটার কথা জানতে পারল তখন আর দেরি করেনি।

তপন আলতো গলায় বলল, "ম্যাডাম, ওই লোকটি আবার ফোন করবে কালকে। কী বলব আমি?"

বোবো বলল, "বলবে কলকাতায় এসে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। ফোনে কথা বলব না আর এখানে এলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে, বুঝেছ?"

তপন চলে যাওয়াতে ছাদে আবার একা হয়ে গেল বোবো। এবার প্রাণ খুলে হাসল ও। নারায়ণ চক্রবর্তী কী ভেবেছিল যে, এমন করে লেজে খেলাবে ওকে! লোকটা বুঝতে পারেনি যে, বোবো ওর লেজটাই কেটে দিতে পারে!

আসলে ঘটনাটা শুরু হয়েছিল ইক্কির করা বিকেলবেলার ওই ফোন থেকে। মনে-মনে ভীষণ উত্তেজিত থাকলেও ফোন ধরার সময় নিজেকে খুব সংযত করে রেখেছিল বোবো। ইক্কি ওর স্বভাবসিদ্ধ বেয়াড়াপনা নিয়ে বলেছিল, "কী ব্যাপার তোমার? কত বড় বিজনেসওম্যান হয়ে গিয়েছ যে, আমার ফোন ধরছ না! আমার দরকার আছে তোমার সঙ্গে। গল্প করার জন্য ফোন করছি নাকি? আমিও ব্যস্ত থাকি। আমার দু'কোটি টাকা ধার লাগবে। কবে দিতে পারবে আমায়?"

রাগের ভিতরও বোবো অবাক হয়েছিল ইক্কির সাহস দেখে। এতকিছুর পরও ও এসব বলছে! ও কী ভেবেছে যে, যা খুশি করে যাবে আর বোবো জানতে পারবে না কিছু?

"কী হল? আর ইউ ডেফ? কান্ট ইউ হিয়ার মি? দু' কোটি টাকা। একটা নতুন প্রজেক্টে হাত দেব। ব্যাঙ্কে এমনিতেই বার্ডেন বাড়ছে। তাই তোমায় বলছি। বিয়ের সময় তো টাকা দিতেই, সেখানে না হয় কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে নেব," ইক্কি এমন করে বলেছিল যেন ওর বাবা টাকা গচ্ছিত রেখে গিয়েছে বোবোর কাছে।

বোবো রাগটা সামলাতে পারছিল না আর। মনে হচ্ছিল, ব্রহ্মতালু ভেদ করে লাভার মতো ছিটকে বেরবে উপর থেকে। মা-বাবা কেন যে এই ছেলেটার সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যাপারে রাজি হয়েছিল! আর বোবো নিজেও কেন মেনে নিয়েছিল তখন, কে জানে!

"বোবো," ইক্কি চিৎকার করে উঠেছিল এবার, "চুপ কিঁউ হ্যায় তু? দিমাগ গরম না করিয়ো মেরা। কব তক রুপিয়া মিল সকতা হ্যায় মুঝে? আই ওয়ান্ট দ্যাট উইদিন সেভেন ডেজ।"

"ইকজ্যোৎ," বোবো সামলেছিল নিজেকে, "শোনো, আমি তোমার সঙ্গে কোনও রিলেশন রাখতে চাই না আর। আয়্যাম ব্রেকিং আপ উইথ ইউ।"

"ক্যায়া?" ইক্কি যেন বুঝতে পারেনি!

"আমায় আর ফোন করবে না। ডিসটার্বও করবে না। দিদিকে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করিয়েও লাভ হবে না। আমি আর তোমার সঙ্গে নেই। গুড বাই।"

"সালি," দাঁত চেপে হিসহিসে গলায় বলে উঠেছিল ইকোজ্যোৎ, "তোর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসব। কত সাহস যে, ব্রেক আপ করছিস? তোর বাড়িতে ঢুকে তোকে বের করে আনব।"

"ট্রাই দ্যাট," বোবো শান্ত গলায় বলেছিল, "ইতরোমো করলে জিভ ছিঁড়ে দেব টেনে।"

"তুঝে তো ম্যায়..." ইক্কি কী বলবে যেন বুঝতে পারছিল না।

"ফাক ইউ..." বোবো আর কথা না বাড়িয়ে কেটে দিয়েছিল ফোনটা।

ইক্কি তারপর অনেকবার ফোন করেছিল। ও ধরেনি। এসএমএস করে অনেক খারাপ কথা লিখেছে, বোবো একটারও উত্তর দেয়নি।

দিদি ফোন করেছিল এই নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু বোবো স্পষ্ট করে বলেছিল, এই নিয়ে ও কারও সঙ্গে কথা বলবে না। ওর জীবনের ডিসিশন এখন থেকে ও নিজেই নেবে। দিদি কান্নাকাটির সঙ্গে রাগ মিশিয়ে একটা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বোবো এবার ঠিক করে রেখেছিল নিজেকে। দিদিকে দাঁত ফোটাতে দেয়নি একটুও। এরপর ওর মনে হয়েছিল নারায়ণ চক্রবর্তীর খবর নিতে হবে। পলিটিক্যাল কনট্যাক্ট খুব-একটা বেশি ব্যবহার করে না বোবো। কিন্তু এবার করতেই হয়েছিল। নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে এক রাতে কিছু ছেলে গিয়ে আচমকা দমাদ্দম ইট মেরেছিল। তার কিছুদিন পর জীবন আর সংগ্রামকে রাত্রিবেলা কারা যেন বেধড়ক মেরে ফেলে এসেছিল বাড়ির সামনে।

নারায়ণ চক্রবর্তী ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। কী করবে বুঝতে পারছিল না। তখন স্থানীয় এক নেতা গিয়ে ইক্কির কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বুঝিয়ে এসেছিল নারায়ণকে। আর বলেছিল যে, পার্টির মাথারাও চায় সাউথল্যান্ড রিয়েলটর্স-ই জমিটা নিক।

কিছু মানুষ হল টুথপেস্টের মতো। চাপ না খেলে তারা কাজ করে না। এখন নারায়ণ চক্রবর্তী উঠেপড়ে লেগেছে জমিটা বোবোকে দেওয়ার জন্য। শুধু মেজভাইয়ের ভাগটা বোবোকে নিজে থেকে বুঝে নিতে হবে। সেই জমির দাম বাদ দিয়ে বোবো বাকি টাকাটা দেবে ঠিক করেছে। তারপর ওই মেজভাই ভদ্রলোকের সঙ্গে ও বুঝে নেবে বাকি জমির ব্যাপারটা।

আজ মাথাটা হালকা লাগছে বেশ। তা কি এই সমস্যাগুলোর একটা সমাধান হয়েছে বলে? নাকি এই হাওয়ার জন্য। আজ আর কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল বোবো। আর পাঁচিলের দিকে গেল না। ছাদের পাঁচিলগুলো দেড়ফুট মতো হাইট অবধি গাঁথা হয়েছে। এখনও বেশ কাজ বাকি। বোবো ছাদের সিঁড়ির কাছে ত্বপ করে রাখা সিমেন্টের বস্তার উপরটা হাত দিয়ে ঝেড়ে তাতে বসল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল একটা।

আবার কে এল? বোবো মুখ বাড়িয়ে দেখল। আরে, নাঙু! নাঙু উপরে উঠে এসে হাঁপাল একটু। তারপর বলল, "কী রে, ব্যবসা-পত্তর করার ইচ্ছে নেই? এমন করে দিনের পর দিন এখানে এসে পড়ে থাকলে হবে? আর ছাদে বসে কী করছিস? ইস্, নোংরা জায়গায় বসে আছিস কেন? ওঠ।"

বোবো হেসে উঠে পড়ল। বলল, "তুমি হঠাৎ এলে?"

নাঙুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "ইক্কি আসছে এখানে। যে-কোনও সময় এসে পড়বে। আমি খবর পাওয়ামাত্র এসেছি। আমি চাই না কোনও গন্ডগোল হোক। দারোয়ানকে বললে গেট দিয়ে

ইক্কিকে ঢুকতে বারণ করলে হত, কিন্তু তা হলে গেটে বিচ্ছিরি সিন হতে পারে!"

বোবো চিন্তিত মুখে বলল, "ইক্কি? ও এখানে আসবে কেন?"

"ওকে আজ নারায়ণ চক্রবর্তী বলে দিয়েছে যে, জমি দিতে পারবে না। আর এই হিন্টও দিয়েছে যে, এর পিছনে আমাদের কারসাজি আছে। তাই ইক্কি বোঝাপড়া করতে আসছে।"

"তুমি জানলে কী করে?" বোবো অবাক হল।

নাঙু থুতনিতে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর সঙ্গে অশান্তি হওয়ার পর আমি ইক্কির ড্রাইভারটিকে লোক দিয়ে ফিট করেছি। ইক্কি কোথায় যায় না যায়, তার সব খবর আমার কাছে আসে। এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে, যে-কোনও সময় চলে আসবে ও।"

বোবো মুখ ঘুরিয়ে মেন গেটের দিকে তাকাল। দু'টো ট্রাক ঢুকল মেন গেট দিয়ে। নিশ্চয়ই কোনও মাল এসেছে। রোজই তো কিছু না কিছু আসে। কিন্তু ইক্কির গাড়ি কই? তবে কি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল? আর ঠিক তখনই পিছনে শব্দ শুনল একটা।

ঘুরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল বোবো। ইক্কি! নাঙুর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইক্কি! তবে পিছনের গেট দিয়েই ঢুকেছে ও! ওর সাদা শার্টটা কেমন যেন অবিন্যস্ত। হাতদু'টো গোটানো। বুকের কাছের বোতাম খোলা। গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন পাগলাটে।

নাঙু চোখের ইশারায় বোবোকে শান্ত থাকতে বলল।

বোবো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "তুমি? কী দরকার?"

ইক্কির নিঃশ্বাসে যেন হলকা বেরচ্ছে। ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "হোয়াই ইউ ডিড দিস?"

"ডিড হোয়াট?"

"ইউ নো ইট ইউ বিচ..." আচমকা গলা চড়াল ইক্কি।

"ইক্কি!" নাঙু পাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ইক্কির।

ইক্কি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকাল নাঙুর দিকে। খসখসে গলায়, "ইয়ে বুড়াও, হট হিয়াসে। হট বে..." বলে ধাক্কা দিল নাঙুকে।

আচমকা ধাক্কায় নাঙু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

আর নিজেকে সামলাতে পারল না বোবো। প্রায় দৌড়ে গিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ডানহাতটা চালাল। চটাস শব্দে হাতটা পড়ল ইক্কির গালে।

ইক্কিও মার সামলাতে না পেরে টলে এল একটু। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সামলেও নিল নিজেকে।

"শালি, রান্ড। আজ তু গয়ি।"

ইক্কির ভিতরের জন্তুটা অবয়ব ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল যেন! নাঙু মাটিতে পড়ে অসহায়ের মতো দেখছে।

কী করবে বুঝতে না পেরে বোবো পিছতে লাগল। ইক্কি গালাগালি করতে-করতে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে ও। মুখ-চোখ লাল। এ যেন খুনির দৃষ্টি!

ইক্কির থেকে চোখ সরিয়ে বোবো দ্রুত পিছতে লাগল। ইক্কি এসে পড়ল বলে! হাত তুলে মারের ভঙ্গি করে আছে। বোবো পিছিয়ে গেল শেষ কয়েকটা পা। হাত তুলে ইক্কিকে ঠেকাতে গিয়ে পিছনে হাঁটুর নীচে কীসের যেন ধাক্কা খেল বোবো। ছাদের পাঁচিল! টাল সামলাতে না পেরে পিছন দিকে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। হাত বাড়িয়ে শেষবারের মতো কিছু ধরতে গেল ও। কিন্তু পারল না। শুধু বুঝতে পারল ও ভাসছে। শূন্যে।

বিকেলের রোদ-মাখা একটা আকাশ উপুড় হয়ে আছে ওর উপর। পায়ের তলায় শূন্যতা। হালকা শরীর। নরম পালকের মতো হাওয়া

কেবল ছুঁয়ে যাচ্ছে ওকে। এক মুহূর্তের জন্য ভয় লাগল বোবোর। ছাদ থেকে পড়ে গেল! নীচে তো বাঁধানো শান। পড়লে আর রক্ষে নেই। তবে? তবে কি শেষটা এভাবেই হল? তিমি মাছের পেটে বন্দি রাজকন্যার তবে পতন হল এমনভাবে?

বেশ তবে এমনভাবেই শেষ হোক! বোবো একদম ছেড়ে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল নিজেকে। ক্লান্ত, বড্ড ক্লান্ত ও। এবার বিশ্রাম পাবে। দীর্ঘ ছেদহীন এক বিশ্রাম। বুক ভরে শ্বাস নিল বোবো। তারপর আলতো করে বন্ধ করে নিল দু'টো চোখ। আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখল, একটা ছেলে মাথা নিচু করে পার হয়ে যাচ্ছে ট্রাম লাইন। আলুক-ঝালুক ফুটপাথে তখন লাল-হলুদ ফুল। দেখল ছেলেটা কোনওদিকে তাকাচ্ছে না, মাথা নামিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। দূর থেকে আরও দূরে শুধু চলেই যাচ্ছে। আর পাগল হাওয়ায় উড়ছে তার গোলাপি শার্টের প্রান্ত, নীল ঝোলা ব্যাগ!

আমার গল্প

দ্বিতীয় ভাগ

আবার আমার গল্প। ঘুরে-ফিরে আমরা সেই আমাদের গল্পেই ফিরে আসি। আসলে ছোটবেলা থেকেই আমাদের মনে নিজেদের নিয়ে একটা গল্প তৈরি হতে থাকে। বয়স কম থাকে বলে প্রথমদিকে সেই গল্পটা হিন্দি ছবির মতো হয়ে যায় খানিকটা। কিন্তু যত সময় যেতে থাকে, সেটার পালিশ আর র‍্যাপিং উঠে ক্রমশ সেটা ডাল-ভাতের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার যখন কুড়ি বছর বয়স, সেসময় আমার ডাল-ভাতটা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই ঝিনুকবাঁকের বাড়ির কাছে একটা ইটভাঁটা ছিল। আমি দেখতাম, সেখানে কত মানুষজন কাজ করতে আসত। সময় থাকলে আমি সেই ইটভাঁটার কাছে গিয়ে তাদের কাজ দেখতাম। পরিশ্রমী মানুষ দেখতে চিরকাল ভাল লাগে আমার। আর ভাল লাগে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখতে।

সেরকমই একদিন তাদের কাজ দেখতে-দেখতে আমি বুঝতে পারলাম আমি কী করতে চাই। ওই ভাঁটার কাজ করতে আসা গরীব মানুষগুলোর অমানুষিক পরিশ্রম দেখে বুঝলাম আমাদের মতো দেশে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা সবচেয়ে বেশি দরকার। আমি নিজে একা খুব ভাল থাকলাম, তার চেয়ে আমি অনেক মানুষকে নিয়ে ভাল থাকলাম-টা এই দেশটার কাছে জরুরি।

তখন থেকেই ছোটবেলার স্বপ্নটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। ঠিক করেছিলাম, চাকরি করব না। বরং আমি নিজের চেষ্টায় এমনকিছু করব যাতে আরও পাঁচজন কাজ পায়। সেখান থেকেই আমার মনে হয়েছিল আয়ুর্বেদিক প্ল্যান্টেশন ব্যবসার কথা। সেই সঙ্গে সেই রোজগার থেকে উঠে আসা টাকায় আমি একটা ওল্ড এজ হোম চালাব।

স্বপ্ন। স্বপ্ন ছিল আমার। চোখের চেয়ে বড় স্বপ্ন। কিন্তু ড্রিম হচ্ছে পয়সাওলা আর কুঁড়েদের লাক্সারি। আর রিয়্যালিটি টিভির পরদায় দেখানো দাঁত-নখ বের করে জেতার মরিয়া চেষ্টা।

লাক্সারি আমার পোষাল না। বোবো চলে যাওয়ার পর আমার জীবন এমন ধাক্কা খেল, যেন পাহাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়া টুরিস্ট বাস।

সেই খাদ থেকে হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে উঠতে-উঠতে দেখলাম, আমার জীবনের কোথা দিয়ে যেন গলে গিয়েছে কয়েকটা বছর। দেখলাম, আর-পাঁচজন তো দূরের কথা, আমার নিজের পেট চালাতেই সমস্যা হচ্ছে।

কিন্তু দেরিতে হলেও জীবন সকলকে একটা অন্তত সুযোগ দেয়। একবার অন্তত উঠে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের দিকে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। ছোট বা বড় যেমনই হোক, হাত একটা সে দেয়ই। আর আর্কটিক ভিলেজ আমাকে সেই হাতটাই দিয়েছে। আমার জীবনে আমি এত বড় অর্ডার কোনওদিন পাইনি!

সেদিন ওই বজবজের সাইটে অমনভাবে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে চলে যাওয়াটা যে আমার ঠিক হয়নি তা ওই গাছতলায় দাঁড়ানো উসকো-খুসকো মানুষটাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম যে, আমায় তো আর মহাকাশের ছবি তোলার জন্য অমন টেলিস্কোপ বানাতে হচ্ছে না! আমায় শুধু চেষ্টা করতে হচ্ছে বিকাশ নামে একটা লোককে টপকে কাজ পাওয়ার। এটা আমি পারব না? কোন ভদ্রমহিলা কী মুডে একটু রাগ দেখিয়ে ফেলেছে, তার জন্য এমন করে চলে আসার কোনও মানে হয় না।

দু'দিন পর আমি তাই আবার গিয়েছিলাম আর্কটিক ভিলেজে। বিকাশ সেনাপতি আমায় বসিয়ে রেখেছিল দেড় ঘণ্টা। তারপর আমায় অবাক করে দিয়ে এসে বলেছিল, "আপনি থ্যাচড রুফিঙের মেটেরিয়াল সাপ্লাই করতে পারবেন?"

"থ্যাচড রুফিং?" আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, "মানে, ঘর ছাওয়ার ছাউনি লাগবে আপনাদের?"

"হ্যাঁ, আর্টিফিশিয়াল তালপাতার মতো দেখতে ছাউনি, পলিমার বেস্‌ড। জানেন তো সেটা কী? আরে যা দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়। দেখেছেন তো? একদম পাতার মতো দেখতে, দেখেননি?"

"হ্যাঁ, দেখেছি," আমি মাথা নেড়েছিলাম। আসলে দেখিনি আমি। নিজে হাতে নিয়ে দেখিনি। কিন্তু কাজ পেতে গেলে তো আর সদা সত্য বলিব-র মতো কনসেপ্ট আঁকড়ে বাঁচা যায় না!

"পারবেন?" বিকাশ হেসেছিল এবার, "ভয় নেই, তার জন্য আপনাকে আমায় কিছু দিতে হবে না। নাকছাবিও না। সেটা জাস্ট আপনাকে কাটানোর জন্য সেদিন বলেছিলাম।"

"ও..." আমি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। বিকাশ কি সত্যি বলছে? আচ্ছা, মিথ্যে বলেই বা ওর কী লাভ!

"এমন ভ্যাবলা মেরে গেলেন কেন? পারলে আমায় পরশুর মধ্যে কোটেশন এনে দিন। কত দাম নেবেন আপনি বলুন। পোযালে দ্রুত অর্ডার পেয়ে যাবেন।"

"কত কোয়ানটিটি লাগবে?"

"আপনি ইউনিট রেট দিন। তারপর বলব। আসলে একটা লোককে দেওয়া ছিল কাজটা। সে খুব ঝুলিয়েছে। আর বিদেশ থেকে আনতেই পারতাম, কিন্তু ওরা অনেক বেশি কোয়ানটিটি ছাড়া পাঠাবে না। আমাদের তো অত দরকার নেই। আমাদের স্যার বললেন, তাড়াতাড়ি করতে। আপনি যদি তাড়াতাড়ি পারেন তবেই দাম দেবেন। না হলে নয়। আর দেখবেন ওগুলো যেন ফায়ার রিডানডেন্ট হয়।"

কলকাতায় ফেরার পথে আমার মাথায় ঘুরছিল কোথায় গেলে আমি এর দাম পাব। কার কাছে পাব? এমন জিনিস যে পাওয়া যায়, তাই তো জানতাম না। সেখানে দু'দিনের মধ্যে আমি এর দাম জোগাড় করে, প্রফিট যোগ করে বিকাশ সেনাপতিকে কোটেশন দিতে পারব?

শিয়ালদায় ট্রেন থেকে নেমে আমার প্রথম মনে এসেছিল পিঁড়ির কথা। ফোন করে খোঁজ নিয়েছিলাম কোথায় আছে ও। কলেজ ষ্টিট শুনে ওকে বলেছিলাম যে আমি আসছি, ও যেন কলেজ স্কোয়্যারে থাকে।

"ঘরামির কাজ করবে নাকি?" পিঁড়ি আমার কথা শুনে প্রথমে হি-হি করে হেসেছিল খুব।

আমার রাগ হয়েছিল, "'যদি করি, তোর আপত্তি আছে?"

কলেজ স্কোয়্যারের জলের ধারে বসে কথা বলেছিলাম আমরা। বাচ্চারা পুলের জলে দাপাচ্ছিল খুব। শেষ বিকেলের নরম একটা হাওয়া আসছিল জল ছুঁয়ে।

পিঁড়ি সিমেন্টের বসার জায়গায় পা তুলে বসে বলেছিল, "আরে গুরু, ফালতু খচে যাচ্ছ! আমি বলছিলাম সেই প্রবাদের কথাটা, ঘরামির ঘর ছাওয়া হয় না! জানো তো?"

"বড্ড বাজে বকছিস। জানলে বল, না হলে আমি অন্য-জায়গায় খবর নেব।"

পিঁড়ি বলেছিল, "আমি জানি না। তবে যে জানে তাকে ফোন

Puja Desh B/W F21(Page 325-340=16 Pages)

করছি, দাঁড়াও।"

"কাকে?" আমার কৌতূহল হয়েছিল।

"আমার চোখে যে পৃথিবীর স্ট্রংগেস্ট ম্যান, তাঁকে," বলে পিঁড়ি পকেট থেকে ওর মোবাইলটা বের করেছিল।

"মানে? সে কে?"

পিঁড়ি ডায়াল করে মোবাইলটা কানে লাগিয়ে বলেছিল, "আমার বাবা। আমার সার্চ ইঞ্জিন।"

ও যতক্ষণ ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছিল, আমি চুপ করে জলের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখছিলাম একটা বাচ্চা ছেলে কীভাবে ছোট-ছোট হাতদু'টো দিয়ে পুলের জল কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে।

"হয়েছে," ফোনটা রেখে পিঁড়ি বলেছিল, "বাবা জানে, কোথায় পাওয়া যায়। আসলে আমাদের দেশে ওগুলো বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আসে। কিন্তু কলকাতার কাছে, ওই হাওড়ার আন্দুলে এখন একটা কোম্পানি এটা বানাচ্ছে। বাবা ঠিকানাটা নিয়ে রাখবে। আমি তোমায় কাল সকালে দেব। কেমন? আর যদি অন্যকিছুও দরকার পড়ে, তুমি আমায় বলবে কিন্তু সমদা। চেপে রাখবে না। জানবে আমি তোমার পাশে আছি।"

আমি বলেছিলাম, "বাঁচালি ভাই। আমি খুব চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। আসলে কাজটা আমার খুব দরকার। আমার নিজের কথা বাদ দে। গজাকে যে কথা দিয়েছি, সেটা অন্তত রাখতেই হবে।

পিঁড়ি বিরক্তিতে মাথা নেড়েছিল, "মাইরি তোমার রেকর্ডে গান এগোয় না? এমন পিন আটকানো অবস্থা কেন তোমার?"

"পিঁড়ি, এমন বলিস না," আমি বলেছিলাম, "গজার মা মারা যাচ্ছে।"

"আরে, আমরা সবাই মারা যাচ্ছি সমদা। পার্থক্য হল কেউ দু'মাসের মধ্যে মারা যাবে আবার কেউ ষাটবছরের মধ্যে। কিন্তু মারা যাবেই। এটাকে ওভার-ড্রু করার মানে হয় না। শোনো, ওসব বাদ দাও। দৌড়তে হলে, দৌড়টাকেই মাথায় রাখ। অত বোঝা নিয়ে দৌড়লে জেতা যায় না বুঝেছ?"

আজ সকালেই পিঁড়ি এসে আমায় দিয়ে গিয়েছে ওই ঠিকানাটা। কোম্পানির নাম 'বিউটি রুফ'। ফ্যাক্টরি আন্দুলে হলেও ওদের অফিসটা হরিশ মুখার্জি রোডে। এখন আমি সেখানেই বসে আছি। এদের ভিজিটার্স রুমটা বেশি বড় নয়। আরও দু'জন অপেক্ষা করছেন। আমি ফ্রন্ট ডেস্কে বলেছি যে, একটা অর্ডারের ব্যাপারে একজন সেল্‌স রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আমায় বসতে বলা হলেও এখনও ডেকে পাঠায়নি। জানি না কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

মোবাইল বের করে সময় দেখলাম আমি। সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ বোনের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে ওর কলেজের কাছে। বাবার ওষুধ কিনতে হবে। তার প্রেসক্রিপশনটা দেবে আমায়। আমি কাল কিনে নিয়ে যাব।

বাবার জন্য আজকাল খুব চিন্তা হয় আমার। কেমন যেন বুড়ো আর চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে! আসলে যে-মানুষটাকে আমার মনে হত পৃথিবীর সবচেয়ে উদ্যমী আর সাহসী, সে-ই যখন চোখের সামনে এমন হয়ে যায়, কী যে কষ্ট হয়! হেমন্তকাল খুব খারাপ লাগে আমার। কেমন যেন হারিয়ে ফেলার সময় এটা। বাবাকে দেখলে আমার মনে হয়, এই মানুষটারও হেমন্ত চলছে। এবার শীত এল বলে।

ঝিনুকবাঁকে থাকার সময় বাবা কিন্তু এমন ছিল না। মা মারা যাওয়ার পরও লোকটা সামনে থেকে আমাদের আগলেছে। কিন্তু ঠাকুরদার মারা যাওয়াটা যেন বাবা নিতে পারল না আর! যে-লোকটা বাবাকে বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে তাঁর প্রতি যে কী টান ছিল বাবার! ঠাকুরদার মৃত্যু বাবাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল খুব। সেই থেকেই কোথায় যেন লোকটা ভেঙে গেল একদম। টগবগে মানুষটাকে হেমন্ত এসে ধরল। সবুজ মানুষটা চোখের সামনে বাদামি হয়ে গেল কয়েক বছরের ভিতর।

"আপনি আসুন," একটা রোগামতো ছেলে এসে ডাকল আমায়। আমি উঠলাম।

ছেলেটা বলল, "এই করিডর দিয়ে সোজা গিয়ে বাঁদিকে একটা বড় হল পাবেন। সেখানে সজল রায় বলে ভাল স্বাস্থ্যের একজন বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে।"

বুঝলাম ছেলেটার অন্য কাজ আছে, তাই আমাকেই একা যেতে হবে।

করিডরটা পার করে বাঁহাতে হলটা পেলাম আমি। ছ'টা চেয়ার-টেব্‌ল রাখা আছে হলে। যার দু'টোতে মানুষ বসে। সজল রায় নামে ভদ্রলোককে চিনতে অসুবিধে হল না। মধ্য চল্লিশ বয়স লোকটার। তবে লোকটাকে শুধু ভাল স্বাস্থ্য বললে কিছুই বলা হয় না। বরং বলা যায় এমন মোটা আমি খুব একটা দেখিনি। যে-চেয়ারটায় বসে আছেন, সেই চেয়ারটার জন্য কষ্ট হল আমার। ওটার ঠিক সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছে।

আমি আমার ভিজিটিং কার্ড সামনের টেব্‌লে রেখে হাতজড়ো করে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "আমার নাম সমন্বয় চক্রবর্তী। আমি আপনাদের আর্টিফিশিয়াল রুফিং সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি।"

সজল আমায় সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন, "বসুন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে আর্কটিক ভিলেজের নাম না করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বললাম আমার দরকারটা।

ভদ্রলোক মন দিয়ে শুনলেন সব। তারপর বললেন, "বুঝলাম। তা যারা করছে তারা নিজেরা না এসে আপনাকে দিল কেন এসব সাপ্লাই করতে?"

আমি বললাম, "আমি ওদের হয়ে কাজ করে থাকি। আমাকে বিশ্বাস করে খুব।"

সজল হাসলেন, "যাক। আপনার কথা শুনে বুঝলাম যে, আপনি বিশেষ কিছু জানেন না এসব ব্যাপার সম্বন্ধে। হতেই পারে। আসলে আর্টিফিশিয়াল রুফিংটা এখন খুব চলে। পলিমার বেস হয় এগুলো। দেখতে একদম ন্যাচেরাল। ফায়ার প্রুফ। ইউভি রে, ঝড়-জল-বৃষ্টি, পাখির নোংরা কিচ্ছু কাবু করতে পারে না এদের। এক বৃষ্টির জলেই সব ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। এক-একটা গোছা হিসেবে পাওয়া যায়। আমরা বলি টাইল্‌স। এমন করে তৈরি করা হয় যে, দূর থেকে দেখলে ভাববেন ওরিজিন্যাল। আমরা কুড়িবছরের গ্যারান্টি দিয়ে জিনিস বিক্রি করি। যদি না কেউ ইচ্ছে করে ফিজিক্যালি ড্যামেজ করে জিনিসটাকে।"

আমি যতদূর পারি কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম, "এর ব্রোশিওর আছে নিশ্চয়। আর রেটটা যদি বলেন।"

"ব্রোশিওর তো আছেই। দেব আপনাকে। রেটটাও বলব। আর ডেলিভারি, টার্মস অব পেমেন্ট সব বলব। কিন্তু দু'দিন সময় লাগবে যে ভাই।"

"দু'দিন?" আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল, "কিন্তু মিস্টার রায় আমার যে আজকেই চাই।"

"আজকে?" সজল হাসলেন, "এত তাড়া কীসের?"

"কাজটা আর্জেন্ট। না হলে খুব বিপদে পড়ব। আমি ছোট ব্যবসা করি। কথার দামই আমার গুডউইল। আমি বলেছি আজ সন্ধে হলেও আমি আজকেই দামটা ওদের জানাব। আপনি প্লিজ একটু দেখুন, প্লিজ," আমি যথাসম্ভব কাতরমুখে কথাগুলো বললাম। কারণ মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেলে লোকটা আমায় ঘোরাবে। আমি ছোট পার্টি তো তাই আমায় ঘোরানো সহজ। আর এমন করে না বললে কালকেও দামটা দিতে পারব না।

সজল ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আমায় মাপলেন। মনে হল কোনও বড়সড় সিলমাছ আমায় দেখছে, পরীক্ষা করছে।

"ঠিক আছে," সজল হাসলেন, "আপনি বিকেলের দিকে আসুন, আমি আপনার জন্য কোটেশন বানিয়ে রাখছি। তবে..."

"কী তবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের পেমেন্ট টার্মস জানেন তো?"

"পেমেন্ট টার্মস?"

"হ্যাঁ, আমরা গোটা পেমেন্টটা প্রোফর্মা ইনভয়েসের এগেনস্টে নিয়ে নেব। কোনও ধারবাকির সিন নেই। গোটা টাকা দেবেন প্রথমে। সেটা পেলে আমরা মাল সাপ্লাই করে দেব। তারপর আমাদের লোক গিয়ে ফিট করে দেবে তার সাতদিনের মধ্যে। পরে ফিটিং চার্জ দিয়ে দেবেন। কেমন?"

"গোটা পেমেন্ট দিয়ে মাল নিতে হবে?" যে-বজ্রটা মাথায় পড়বে-পড়বে করেও তখন পড়েনি, এবার সেটা যেন ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে দিল আমার।

"হ্যাঁ ভাই, আপনি নতুন লোক। ছোট কোম্পানি। আপনাকে বিশ্বাস করব কী করে বলুন? কাজ করতে হলে আপনাকে ভাই এটা মেনেই করতে হবে।"

এত টাকা আমায় দিয়ে মাল তুলতে হবে? কে দেবে এত টাকা? পার্টি তো একটা টাকা অ্যাডভান্স দেবে মাত্র। কিন্তু গোটা টাকা তো দেবে না! তবে? কী করব? কোথা থেকে জোগাড় করব টাকা? আমি তাকিয়ে রইলাম সজল রায়ের দিকে। আমার চোখদু'টোও কি সজল হয়ে উঠল? না হলে মানুষটাকে এমন আবছা মনে হল কেন?

জীবন সুযোগ দেয়, একবার হলেও আমাদের সুযোগ দেয়, কিন্তু তার ভিতরেও একটা গিঁট থাকে। আমাদের নিজেকে অতিক্রম করার জন্য পরীক্ষা থাকে। বুঝলাম, বকের সামনে খাবার দেয় জীবন। কিন্তু ঘড়ায় দেয় না, দেয় থালায়!

২

একটা স্বপ্ন কি মানুষ বার-বার দেখে? একটা ঘটনা কি নানারকমভাবে ফিরে আসে তার কাছে? ঘুমের মধ্যে, জাগরণের মধ্যে? তুলো বীজের মতো কি উড়ে বেড়ায় মানুষের মনে?

একটা মাঠ। ফসল কেটে নেওয়ার পরের একটা মাঠ। গেরুয়া, একলা। আর তার শেষ প্রান্ত দিয়ে হেলে-দুলে চলে যাচ্ছে ছোট্ট এক গোরুর গাড়ি। আকাশে তখন গড়িয়ে নামছে সন্ধে। নিঃসঙ্গ তারাটি বাতিল রাংতার মতো পড়ে আছে আকাশের কোনায়। আর মিহি হাওয়া মিঠাইয়ের মতো একটা হাওয়া বইছে চরাচরজুড়ে।

হাওয়া বইছে? কীভাবে বইছে হাওয়া? আর আমি বুঝতে পারছি কী করে? স্বপ্ন তো মানুষ দেখে, তা হলে শরীরে তার স্পর্শ অনুভব করে কী করে?

আমি করি। বার-বার এই স্বপ্নটা আমার ঘুমের ভিতর ফিরে আসে আর আমি অবাক হয়ে অনুভব করি, নরম একটা হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমায়! হালকা একটা শিরশিরানি নিয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায় তারপর।

সেই বোবোর চলে যাওয়ার পর থেকেই এই স্বপ্নটা আমি মাঝে-মধ্যেই দেখি। আর তারপর ঘুম ভেঙে মনমরা চড়াইয়ের মতো বসে থাকি ঝুম হয়ে।

কী মানে এই স্বপ্নটার? কে ব্যাখ্যা করতে পারে একে? আর-কাউকে বলতে ভরসা না পেয়ে আমি একবার ব্যাপারটা বলেছিলাম পিঁড়িকে।

পিঁড়ি সবটা শুনেছিল মন দিয়ে। তারপর ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "কীসের গাড়ি বললে? গোরুর?"

"হ্যাঁ," আমি ধীর গলায় বলেছিলাম।

"ও বুঝেছি!" পিঁড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল একটা।

"বুঝেছিস?" আমি অবাক হয়েছিলাম, "কী বুঝেছিস?"

"ওই তোমার প্রেমিকার সামনে থেকে তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই তো এই স্বপ্নটা দ্যাখো, না?"

"হ্যাঁ। তো?" আমি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

"তুমি কি বাই এনি চান্স নিজেকে গোরু ভাব? মানে, একটা মেয়ে তোমায় বিয়ে করতে চাইল। তারপর মা-বাবার কাছে নিয়ে গেল। আর মা-বাবার প্রেশারে বা অন্য-কোনও কারণে সে সবার সামনে তোমায় টাঙিয়ে দিল গ্যালারিতে। তাই বলছি, তোমার কি নিজেকে গোরু মনে হয়?"

হাসি পেল আমার। স্বপ্নের মনখারাপ করা এফেক্টটা পিঁড়ির এই কথা মনে পড়াতে কেমন যেন নরম হয়ে এল! আমি উঠে বসলাম মেঝে থেকে। গরমটা পড়েছে বেশ। বাইরে যেন আগুনের বৃষ্টি নেমেছে। ফ্ল্যাটের ছাদ আর দেওয়ালগুলো ফাঁকিবাজি করে তৈরি করা হয় আজকাল। গরমকালে বদমেজাজি মানুষের মতো তেতে থাকে ঘরগুলো। আমার গিটারটার কাছে দেখলাম রিঙ্গো চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। জন আর পল শুয়ে আছে পাপোশের উপর। আর জর্জ দরজার কাছে বসে থাবা চাটতে-চাটতে এই পঞ্চম বিট্‌লকেই দেখছে।

পঞ্চম বিট্‌ল! মনে পড়ায় আবার হাসি পেল আমার। বিট্‌লসের গান নিয়ে আমি মাতামাতি করতাম খুব। তাই বোবোই আমার এমন নাম দিয়েছিল। সেসব দিন ছিল বটে! আনন্দের দিন, বেঁচে থাকার দিন। সবার মাঝে উঠে দাঁড়ানোর দিন। আর আজ!

গজা সেদিন বলছিল, "তোর তো কপাল খুলে গেল রে সম। এখন তো শুধু টাকার উপরে শুয়ে থাকবি!"

আমি গজাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম মাসিমাকে দেখতে। আমার সঙ্গে পিঁড়িও ছিল। মাসিমা এখন বাড়িতে। কোনওমতে ওষুধের ঠ্যাকনা দিয়ে চলছে। তবে ডাক্তার বলছে অপারেশনের দেরি করে নাকি বিপদই ডেকে আনা হচ্ছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে এসব শুনতে ভাল লাগছিল না আমার। মনে হচ্ছিল আসলে সব কথা যেন আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। আমি তাই মাথা নিচু করে গম্ভীর মুখে সব শুনছিলাম। ওই যে টাকা দেব বলেছিলাম আর দিতে পারিনি, তার অপরাধবোধ যে কী ভীষণভাবে আমার বুকে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে, সে আর কী বলব!

সেখান থেকে তারপর আমরা গিয়ে বসেছিলাম গজাদের বাড়ির ছোট্ট ছাদটায়।

কলকাতায় সন্ধে নামছিল তখন। আকাশে ইয়াব্বড় বড় সব ভুরু এঁকে বাড়িতে ফিরছিল পাখিরা। ছাদের একপাশে চাঁচের বেড়ার তৈরি টঙে এসে বসছিল মাটি-পাথর রঙের পায়রাগুলো। আর এই সমস্ত দৃশ্য ছাড়িয়ে আকাশের অনেক অনেক ওপরে ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল শুকতারাটি।

আমরা তিনজন ছাদের ঠান্ডা হতে থাকা ব্রহ্মতালুতে বসেছিলাম চুপ করে।

তারপর প্রথম কথা বলেছিল গজাই। বলেছিল, "তোর তো কপাল খুলে গেল রে সম। এখন তো শুধু টাকার ওপরে শুয়ে থাকবি!"

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "মানে?"

গজা বলেছিল, "পিঁড়ি আমায় বলেছে তোর ওই ঘরামির অর্ডারের কথা। ওঃ, অনেক টাকা পিটবি, বল?"

আমি পিঁড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম, "কী বলেছিস তুই? আমি তো সবে কোটেশন দিয়েছি। এখনও কোনও কাজের কনফারমেশন পাইনি। ওই দামে আমায় আদৌ কাজ দেবে কিনা তাই জানি না। আর সেখানে তুই কী বলেছিস?"

পিঁড়ি কিছু বলার আগেই গজা বলেছিল, "আর ন্যাকামো করিস না। আমায় তুই নিজে বলতে পারতিস না? মনে নেই আমি তোকে ডেকে আমার অফিসের ছ' হাজার টাকার কাজ পাইয়ে দিয়েছি। আর সেখানে কাজের কথা লুকোচ্ছিস! এমনটা তোর থেকে আমি আশা করিনি সম!"

আমি বুঝেছিলাম সেদিন হাসপাতালের গজার সঙ্গে এই গজাটার অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। বুঝেছিলাম গজার ভেতরে একটা খারাপলাগা তৈরি হয়েছে। কিন্তু যেটা বুঝতে পারছিলাম না, সেটা হল খারাপলাগাটা কীসের জন্য তৈরি হল! আমি ওকে বলিনি বলে, না আমি কিছুটা হলেও টাকা পেতে পারি বলে।

বলেছিলাম, "শোন গজা, কোনও কাজ কিন্তু আমি পাইনি। পাব কিনা তারও ঠিক নেই। আমি বিউটি রুফ নামে পার্টির থেকে যা দাম পেয়েছি, তার ওপর নিজের প্রফিট চাপিয়ে কোট করেছি। তাও চার

পাঁচদিন হয়ে গেল। এখনও কোনও খবর পাইনি।"

গজা আমার দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, "তা কত প্রফিট রেখেছিস? মানে কত টাকা পাবি কাজটা হলে?"

এমন প্রশ্ন করা আর কে কোন সাইজের জাঙ্গিয়া পরে জানতে চাওয়া একই ব্যাপার।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করছিলাম। ঠিক সেই সময় পিঁড়ি আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে বলেছিল, "আরে তোমরা বাদ দাও তো। আজ সঙ্গে রাম এনেছি। একটা থ্রি ফিফটি আছে। চলবে নাকি?"

পিঁড়ি ওর ঝোলা থেকে লালচে খবরের কাগজে মোড়ানো একটা বোতল বের করে রেখেছিল ছাদে। তারপর তিনটে দোমড়ানো প্লাস্টিকের গ্লাস আর জলের বোতল বের করেছিল।

"আমি খাব না।" নিজে থেকেই বলে উঠেছিলাম, "নীচে মাসিমা অসুস্থ আর পিঁড়ি তুই এসব কী এনেছিস?"

"হ্যাঁ, ওকে দিস না," আমি কথা শেষ করতেই বলে উঠেছিল গজা, "ও ফালতু মাল খেয়ে বাওয়ালি করে ভুলভাল বকবে, আর লোকজন তার উপর ভরসা করে বাঁশ খাবে। আর শোন সম, মায়ের উপর ফালতু সিমপ্যাথি দেখাতে হবে না।"

পিঁড়ি বলেছিল, "আচ্ছা সমদা, মাল খেলে কি তোমার মধ্যে কর্ণ এসে সেঁদিয়ে যায়?"

আমার বিরক্ত লাগছিল। কী এমন বলেছি, তার জন্য এসব শুনতে হবে? গজা কি জানে না যে, আমি চেষ্টা করছি খুব। এমন বাঁকা কথা বলে কেন আমায় ছোট করে এরা?

গজা বলেছিল, "এমন বলিস না পিঁড়ি, ওর এখন গোল্ডেন পিরিয়ড চলছে। ও এখন রাজা!"

"হ্যাঁ তাই তো," আমি আর পারিনি, বলেছিলাম, "উপরে রাজা, ভিতরে ভিখিরি। আমি রাজভিখিরি। তবে শোন, আমি খুব চেষ্টা করছি। আর যদি পারি তবে মাসিমার জন্য আমি টাকা দেবই।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমি নেমে এসেছিলাম ছাদ থেকে। নীচেও এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হাঁটা দিয়েছিলাম।

পিঁড়ি এসেছিল আমার পিছন-পিছন। বলেছিল, "মাইরি, এই তোমার এক দোষ। সব জায়গা থেকে চলে যাও। কে কী বলল, অমনি রোঁয়া ফুলিয়ে চলে গেলে! এত সেন্টিমেন্টাল হলে হয়! সেই তোমার প্রেমিকা থেকে বন্ধু, সকলের সঙ্গে এমন করবে? চলে গেলে কি সমাধান হয় কিছুর? তুমি কি শান্তি পাও?"

আমি বিরক্ত গলায় বলেছিলাম, "এর ভিতরে বোবোকে আনবি না পিঁড়ি। তুই কিচ্ছু জানিস না, তখন কেমন পরিস্থিতি ছিল।"

"সিরিয়াসলি, জানতেও চাই না। তুমি এবার ছেড়ে দাও সমদা। একটা সময় পর ছাড়তে হয়। মৃতদেহ আঁকড়ে পড়ে থাকলে সেখান থেকে দুর্গন্ধই বের হয়। আটবছর আগে তোমায় নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে একটা মেয়ে। ওই সম্পর্কটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ওটা আঁকড়ে বসে সকলের উপর অভিমান করে থেকো না।"

আমি তাকিয়েছিলাম পিঁড়ির দিকে। তারপর শান্ত গলায় কেটে-কেটে বলেছিলাম, "শেষ হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, ওর দিক থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার দিক থেকে হয়নি, হবে না। ওটা চলছে, চলবে।"

পিঁড়িও আমার দিকে তাকিয়ে কেটে-কেটে বলেছিল, "মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।"

সেই সন্ধের পর থেকে তিনদিন হয়ে গেল আমার সঙ্গে পিঁড়ির যোগাযোগ নেই। একটু আগে পিঁড়ির কথা মনে পড়ায় যেমন হালকা হয়েছিল মেজাজটা, এখন আবার ওর কথা মনে পড়তেই মনটার ওজন বেড়ে গেল। পিঁড়িই আমার একমাত্র বন্ধু যে স্বার্থহীনভাবে আমার ভাল চায়। সেও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল!

আজ শুক্রবার। কিন্তু সকাল থেকেই আমার কাজে বেরতে ইচ্ছে করছিল না। আমি দিন আনি দিন খাই টাইপের মানুষ। জানি এসব বড়লোকি ইচ্ছে করাটা আমার ক্ষেত্রে জঘন্য অপরাধ। কিন্তু আমার সত্যি ইচ্ছে করছিল না আজ যেতে। তাই একদিনের সুলতানের মতো আমি ডে অফ নিয়েছি।

শরীরটা তো অফ নিয়েছে, কিন্তু মনটা? আমার তো মনে হচ্ছে পেটের ভিতর বসে কেউ মাছ ধরছে। আর্কটিক ভিলেজকে আমার কোটেশন দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন হল, কিন্তু এখনও কিছু জানাল না ওরা। কী জানি কী ব্যাপার? বলে তো ছিল তাড়াতাড়ি ফাইনালাইজ করবে! গত দু'দিন আগে আমি অবশ্য ফোন করেছিলাম ওই বিকাশ সেনাপতিকে। কিন্তু আমায় এমন করে হাঁকিয়ে দিল যে, কী বলব! বলল, হেড অফিসে নাকি জমা পড়েছে আমার কোটেশন। সেখান থেকে এখনও কোনও কনফারমেশন আসেনি। এলে ও নিজে আমায়

"আচ্ছা সমদা, মাল খেলে কি তোমার মধ্যে কর্ণ এসে সেঁদিয়ে যায়?"

ফোন করে জানিয়ে দেবে। আমি যেন ওকে জ্বালাতন না করি!

জ্বালাতন! কথাটার ভিতর লুকানো অপমান আমার কান এড়ায়নি। কিন্তু গায়ে মাখিনি। কাজের ক্ষেত্রে এসব হয়েই থাকে। আসলে আমার চিন্তাটা আর-এক জায়গাতেও। যদি অর্ডারটা পাই, টাকা পাব কোথা থেকে? ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে গেলে কোমরে যে-জোর লাগে, সেটা আমার নেই। তা ছাড়া ওসব করার সময়ও নেই। আর এমন কাউকে আমি চিনি না যে, আমায় টাকা ধার দেবে। অর্ডারটা পেলে কি তবে টাকার অভাবে সুযোগটা হাতছাড়া করতে হবে? আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। কী যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই উপায় না দেখে পাশের ফ্ল্যাটের দাদার কাছে গিয়েছিলাম।

সেই ঘটনার পর থেকে ওই ফ্ল্যাটটা আমি এড়িয়ে চলি। কুসি বউদি অমন একটা কথা বলে আমার সকালের চা-বিস্কুটের কী যে লোকসান করে দিয়েছে সেটা যদি একবার বুঝত! তাই খুব টেনশন আর ভয় নিয়ে আমি দাদার কাছে গিয়েছিলাম। দাদা সদ্য অফিস থেকে ফিরে স্নান সেরে একটা হুইস্কি নিয়ে বসেছিল। দরজা খুলে আমায় দেখে নিজের টাকে হাত বুলিয়ে বলেছিল, "আরে ফ্ল্যাট ভুল করে এলে নাকি ভায়া?"

আমি বোকার মতো হেসে আড়চোখে দেখেছিলাম বউদি দূরে ডাইনিং টেব্‌লে বসে ছুরি দিয়ে তরকারি কাটছে।

"কী কেস তোমার? কী দরকার বলো।"

দরকার? হ্যাঁ দরকারেই তো এসেছি। তবু মুখের উপর এমন করে বলার পর আমার যেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছিল না। নিজেকে খুব ছোট আর ধান্দাবাজ মনে হচ্ছিল। আসলে দাদা তো আর জানে না আমি কেন আসি না! আমাদের জীবনে বাস্তব আর সত্যের মধ্যে এত তফাত, তার ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গিয়ে কত সম্পর্ক যে নষ্ট হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই।

আমি বলেছিলাম, "দাদা, লোন দেয় এমন কাউকে জানা আছে?"

"লোন? প্রাইভেট? মানে সুদে যারা টাকা খাটায় তাদের কথা বলছ?" দাদা হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

"হ্যাঁ, যদি তেমন কেউ," আমি আবার আড়চোখে তাকিয়েছিলাম বউদির দিকে। বউদি এসব কিছু যেন শুনছিলই না।

দাদা বলেছিল, "তা দরকার তো পড়তেই পারে। ইনভেস্টমেন্ট না বাড়ালে তো আর কোনও ব্যবসা বড় হয় না। আছে তেমন লোক। কিন্তু কত টাকার লোন চাই?"

"এই ধরুন, লাখ তিনেক টাকা," আমি ধরা গলায় বলেছিলাম।

"ও, এটা তেমন কিছু টাকা নয়। কিন্তু যারা সুদ দেয়, তাদের রেট খুব চড়া।"

"তা হোক, ঠিক দিতে পারব," মনে জোর এনে আমি বলেছিলাম।

"তা গ্যারান্টি ছাড়া তো খালি হাতে কেউ টাকা দেবে না। কী গ্যারান্টি রাখবে তুমি, হ্যাঁ?"

মনে হয়েছিল বলি, "আমি আমার সততা, সাহস, লড়াই আর জেদ গ্যারান্টি রাখব" কিন্তু বলিনি। এটা কমার্শিয়াল ছবির ডায়ালগ হিসেবে ভাল শোনালেও বাস্তব জীবনে পুরো জুতো খাওয়ার ছক। তাই আমি কিছু না বলে মানে-মানে সরে পড়েছিলাম। নিজের বেইজ্জতি করে কী হবে!

জলের বোতলটা হাতে নিয়ে দেখলাম জলও গরম হয়ে গিয়েছে। ওঃ, গরম পড়তে না পড়তেই প্রকৃতি চার-ছয় মারতে শুরু করেছে।

কাজে না বেরিয়ে আজ ভুল করেছি খুব। একা-একা এই ফ্ল্যাটে নিজেকে ভূতের মতো মনে হচ্ছে। বেশকিছু অফিসে ছুটকো-ছাটকা জিনিস সাপ্লাই করার কথা ছিল আজকে। কিন্তু কাজে ডুব মারায় জানি আগামিকাল গালাগালি খেতে হবে। স্কুলজীবনে পরীক্ষার পড়া না করে মুভি দেখলে যেমন একটা আশঙ্কা, ভয় আর অপরাধবোধের ত্রিভুজে মনটা আটকে যায়। আমার এখন ঠিক তেমন হচ্ছে।

একবার ঘড়ি দেখলাম। বেরিয়ে পড়ব? আড়াইটে বাজে। ছ'টার ভিতরে যে ক'টা কাজ সারা যায়, সেগুলো সারার একটা চেষ্টা করব একবার?

কী করব বুঝতে পারছি না যখন, ঠিক তখনই ফোনটা বাজল। এখন কে?

আমি ফোনটা তুলেই থমকে গেলাম। বিকাশ সেনাপতি!

"হ্যাঁ-হ্যালো?" কথাটা আটকে গেল যেন গলার কাছে।

"শুনুন, ছোট করে বলছি। টেন পারসেন্ট রিবেট যদি দিতে পারেন তবে কাজটা পাবেন। না হলে নয়।"

"টেন পারসেন্ট?" আমি মনে-মনে হিসেব করতে লাগলাম।

"আমি নেগোশিয়েট করি না। এসব আমার কাজ নয়। পারচেজ এসব করে। কিন্তু স্যারের ডাইরেক্ট অর্ডার আমার উপর আছে। তাই এক্ষেত্রে করতে হচ্ছে। ফোনে আর কথা বাড়াব না। রাজি থাকলে কাল সকালে এখানে চলে আসবেন। রাখছি।"

ফোনটা কেটে যাওয়ার পরও আমি থতমত খেয়ে কানে যন্ত্র সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। টেন পারসেন্ট? আচ্ছা, আমি যদি বিউটি রুফের থেকে কিছুটা দাম কমাতে পারি, তবে তো রিবেট দিলেও অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বিউটি রুফ কি দাম কমাবে? আমার মতো একটা আনকা পার্টিকে কি পাত্তা দেবে?

ফোনের আওয়াজে বিট্‌লসদের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ওরা চুপ করে শুয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আসলে যেন ওরা নয়, তাকিয়ে আছে আমার বোন, আমার বাবা। তাকিয়ে আছে গজা। আর সকলকে ছাড়িয়ে আমার দিকে যেন তাকিয়ে আছি আমি। এবার? এবার কী করব?

আমি চটপট জামাটা গলিয়ে প্যান্টটা পালটালাম। এভাবে বাড়িতে বসে ভাবলে হবে না। আমায় যেতে হবে বিউটি রুফে। চেষ্টা করতে হবে ওদের থেকে যতটা সম্ভব রিবেট পেতে। আর সেটা ওদের কাছে না গেলে হবে না। এভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আর গোল খাব না।

দু'বেলা মরার আগে মরব না। কোনও শালা আমায় মারতে পারবে না। খেলোয়াড় জীবনের মতো আমি নিজেকে চাগাবার চেষ্টা করলাম। হালকা মানিব্যাগটা পকেটে ভরে জুতো পায়ে গলাতে যাব, এমন সময় টিংটং করে পুরনোদিনের রেডিওর বিজ্ঞাপনের কায়দায় ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা বেজে উঠল।

এখন আবার কে? কী বিরক্তি রে বাবা! যেই হোক, বলব সময় নেই। আমার এখন মনে ফোর্স এসে গিয়েছে। আর-কেউ আমায় দাবায়ে রাখতে পারবা না!

ঝটাকসে কায়দা করে আমি দরজাটা খুলে দিলাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার সারা শরীর ঝিলিক দিয়ে উঠল একদম। দম বন্ধ হয়ে গেল নিমেষে। বাতাসে অক্সিজেন যেন কমে গেল অনেকটা। আর অবশ মাথা নিয়ে দেখলাম শাড়ির বিপদসীমাগুলো বিপদতর করে আমার দরজায় খাজুরাহো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুসি বউদি!

৩

আমরা যখন ছোট থাকি, ভাবি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষ হব। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনের সেই বড় মানুষটা হাওয়া ছাড়া বেলুনের মতো কেমন যেন ছোট আর মনমরা হয়ে যেতে থাকে। কেমন যেন তার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, চোখে পাথর এসে জমা হয়। চুলে জট পড়ে। কেমন যেন সে একা আর এলোমেলো হয়ে যায়। তখন সে খোঁজে সামান্য একটু খড়কুটো। সামান্য একটু বাঁচার ভরসা। একটু শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস।

আমার মনের বড় মানুষটাও অমন হয়ে গিয়েছে। সেও এখন একা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাণপণ। আর্কটিক ভিলেজের বাইরে এসে আমি সত্যি লম্বা একটা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আর মাত্র সাতদিনের মধ্যে যদি প্রথম ইনস্টলমেন্টের মাল সাপ্লাই না করতে পারি, তা হলে আমার অর্ডার বাতিল হয়ে যাবে।

আসলে ভুলটা আমার। মাল ডেলিভারি দেওয়ার পিরিয়ড আমি নিজেই দু' সপ্তাহ দিয়েছিলাম। তার ভিতর দশদিন কেটে গিয়েছে। এখনও টাকাই জোগাড় করতে পারিনি। আর বিউটি রুফের সজল রায় আমায় বলেছেন যে, পাঁচ পারসেন্ট রিবেট দেবেন ওঁরা, আর প্রথম লটের জন্য তিনলাখ দিতে হবে না। আমার কথা শুনে ওঁরা এটুকু ফেভার করছেন। কিন্তু অন্তত দু' লাখ টাকার ড্রাফট জমা না দিলে ওঁরা প্রথম লটের মাল দেবেন না। ম্যানেজমেন্ট এর বেশি রিস্ক নিয়ে কিছুতেই আমার মতো নতুন কাউকে এত টাকার মাল দেবে না। ওরা তো ব্যবসা করতে এসেছে। চ্যারিটি করতে তো আর নয়।

তো, তিনলাখটা দু' লাখ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সেটা জোগাড় করাও তো কঠিন। কোথায় পাব এত টাকা? কে দেবে আমায়? কার দায় পড়েছে? তবে কি কুসি বউদির কথাটা মেনে নিলেই পারতাম? নাকি বজবজের ওই সুদখোর মানুষটার কথামতো ওর মেয়েকে বিয়ে করলে ভাল হত? জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না কী করব। শুধু আজকালের মধ্যে কিছু একটা যে করতেই হবে সেটা জানি।

সেদিন কুসি বউদি দুপুরবেলা আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কেন এসেছে? কী চায়? তাই আমি কিছু না বলে তাকিয়েছিলাম বউদির দিকে।

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ভিতরে আসতে বলবে, নাকি এখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলবে?"

আমি আমতা-আমতা করে বলেছিলাম, "মানে আমি... আমি বেরব। মানে..."

বউদি আমায় আলতো ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। তারপর ভিতরে ঢুকে পড়েছিল সটান।

আমি বোকার মতো মুখ করে তাকিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "কী ব্যাপার বউদি?"

"আমার কথাটা তোমার মনে আছে সম?" বউদি আমার চোখে চোখ রেখেছিল।

"কথা? কোনটা?" আমি যেন কিছু বুঝতে পারিনি এমন মুখ করেছিলাম।

"ন্যাকামো করছ সম?" বউদি আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল হঠাৎ।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে, "বউদি প্লিজ, বউদি..." বলে পিছিয়ে গিয়েছিলাম।

"আমি কি প্রেম চোপড়া? তোমায় রেপ করতে এসেছি নাকি?" বউদি ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, "তুমি কি গাধা? আমি তোমায় ভালবাসি সম। ভা ল বা সা। বোঝ তুমি? জান আমার মাপ কত? বাচ্চা নেই। আমার জামা-কাপড় খুললে দেখবে তলপেটে স্ট্রেচমার্কস নেই। থাই-এ নিয়মিত ওয়্যাক্সিং করি। জান নতুন স্টিকার লাগানো আপেলের মতো শরীর আমার। এসব তোমায় দিতে চাই আমি। সবটা দিতে চাই। তুমি বোঝো না নাকি তুমি সমকামী? ছেলেদের পছন্দ করো তুমি? মেয়েদের সঙ্গে থাকলে তোমার সেক্স আসে না?"

এমন কথা আমি কেন আমার চোদ্দগুষ্টি পর্যন্ত শোনেনি কোনওদিন। এর কী উত্তর হয়? কী উত্তর দেব? স্ট্রেচমার্কস, ওয়্যাক্সিং, আপেল! এসবের ঠিক মানে কী?

বউদি আরও এগিয়ে এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল, "তুমি কোনওদিন মেয়েদের সঙ্গে শুয়েছ? তাদের মুঠো করে ধরেছ? নিশ্চয়ই ধরোনি। ধরলে এমন করে থাকতে পারতে না। তোমার দাদাটা একটা অপদার্থ। কিছু পারে না। অত বড় ভুড়ি। ওটা যে কী হিনড্রেনস! আমার ভালই লাগে না। মুখে সিগারেটের গন্ধ। আমার ভাল লাগে না। বমি পায়। আমি তোমায় যে ভীষণভাবে চাই! তুমি কেন বোঝো না সম? তোমার টাকার দরকার আছে আমি জানি। তুমি ভেব না। আমি দেব তোমায় টাকা। আমি বাবার এক মেয়ে। অনেক টাকা আছে আমার। তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি শুধু আমার কাছে থাক। আমার বিয়েটা তো রাখতেই হবে। সামাজিক একটা ব্যাপার তো মানতে হবে। না হলে আমার বাবা-মা মারা যাবে অপমানে। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমি শুধু তোমার থাকব। তুমি দেখো আমি কী-কী পারি। পাগল করে দেব তোমায়। একদম পাগল করে দেব। কত টাকা চাই তোমার? কত টাকা?"

টাকা? টাকা নিলে কী দিতে হবে বউদিকে? আমায়? কত দাম আমার? কত টাকা দিলে পাওয়া যায় আমায়? কত টাকা চাই আমার?

কত টাকা? দুপুর গরম ছ্যাঁকা দিয়েছিল আমার জিভে। আমি কথা বলতে পারছিলাম না।

বউদি কাছে এসে আমার জামা খামচে ধরে বলেছিল, "আমি তোমায় ভালবাসি সম, তুমি ভালবাসবে আমায়? আমায় একটু ভালবাসবে তুমি?"

আমি অসহায়ভাবে বলেছিলাম, "যা আমার নয় তা দিই কেমন করে বউদি?"

"মানে?" বউদি জামা-ছেড়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

আমি ক্লান্ত গলায় বলেছিলাম, "জান বউদি বহুবছর আগে একটা মেয়ে আমায় বলেছিল, আমি তার। বলেছিল, আমি যদি কোনওদিন অন্য-কোনও মেয়ের দিকে তাকাই তবে সেদিনই নাকি ও মরে যাবে। বলেছিল আমার নিজের উপর কোনও অধিকারই নেই।"

"এখন কোথায় সেই মেয়েটা?"

"আমি জানি না বউদি!" অসহায় লাগছিল আমার, "সে আমায় ছেড়ে গিয়েছে।"

"ছেড়ে গিয়েছে? ভাল হয়েছে। তবে কীসের আপত্তি তোমার?"

"আমি যে ছাড়তে পারিনি বউদি। আমি যে আজও সেই চোখদু'টো দেখতে পাই। গলাটা শুনতে পাই। আমি যে অন্য-কাউকে ভালবাসতে পারিনি। পারব না।"

বউদি আমার দিকে তাকিয়েছিল অবাক হয়ে, "এমনভাবে কেউ ভালবাসতে পারে? নাকি, তুমি এসকেপিস্ট? কারও দায়িত্ব নিতে হবে বলেই কি ওই একটা মেয়েকে ঢাল করে চলো? কোনটা?"

আমি কিছু বলতে পারিনি আর। আসলে কী বা বলার আছে আমার? অত তত্ত্ব কথা তো আমি জানি না। বুঝি না। কার্যকারণও সব গুলিয়ে যায়। আমি শুধু ওই চোখদু'টো দেখতে পাই। বোবোর ভুরুর ওই তিলটা দেখতে পাই। মনে হয় যেখানেই থাকুক আসলে বোবো আমার। ওই চোখদু'টো, ভুরুর উপরের ওই তিলটা শুধু আমারই। মনে হয় ওই চোখের আলো যেন নেভে না কখনও। সেই যে কলেজে প্রথমদিন ওকে দেখেছিলাম সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় ও শুধু আমার জন্যই এসেছে পৃথিবীতে। বুঝি, যাকে আমরা সত্যি করে ভালবাসি, তার জন্য সারাজীবন আমাদের অপেক্ষা থাকে। আমাদের তৈরি করতে চাওয়া বৃত্ত অসম্পূর্ণ হয়ে ভাঙা চাঁদের মতো পড়ে থাকে ডায়েরির পিছনে।

বউদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "আমি কিন্তু তোমায় ভালইবেসেছিলাম সম। আমি শরীর নিয়ে এত কথা বললাম বলে তুমি হয়তো খারাপ ভাবছ। কিন্তু সেটার ভিতরে আমার সমর্পণটাই বোঝাতে চেয়েছি। যাই হোক, তোমার টাকার দরকার থাকলে আমায় বোলো। তোমার কোনও কাজে এলে আমার ভাল লাগবে।"

কিন্তু আমার যে ভাল লাগবে না। বরং গায়ে ফোসকা পড়বে আমার। ছ্যাঁকা লাগবে। টাকা পরে ফেরত দিয়ে দিলেও ওই টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা ভুলব কেমন করে? বউদি কিছু হয়তো মুখে বলবে না। কিন্তু একটা না বলা চাহিদা তো থেকেই যাবে। তার কী হবে? সেটাকে সামলাব কেমন করে আমি? অথচ আমার আর হাতে মাত্র সাতদিন সময় আছে। সাতটা দিন। কী করব এই ক'দিনে? কোথায় পাব সেই আশ্চর্য প্রদীপ? কোন দৈত্য সাহায্য করবে আমায়?

"হাই। ডু ইউ বিলিভ ইন গড?"

আমি চমকে গিয়ে দেখলাম সেই লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। কাঁচা-পাকা উড়ো-ঝুড়ো চুলের ফাঁকে একটা নিশ্চিন্ত হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন করছে। আমি থতমত খেলাম। এই পাগল মানুষটা ইংরেজি বলছে! বললাম, "আমায় বলছ?"

লোকটা বলল, "গড। গড মানে জান?"

আমি বললাম, "গড মানে? ভগবান। ঈশ্বর। অলমাইটি। খুদা।"

লোকটা হাসল, "কে বলেছে তোমায়? কোন শালা বলে গড মানে ঈশ্বর! জি ও ডি। গড। মানে, গিভিং আওয়ার ডিভোশন। এটাও জান না? তাও ফুল প্যান্ট পরে ঘুরছ? আর আমি জেনেও থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরি। বুঝলে?"

আমি তাকিয়ে রইলাম। গিভিং আওয়ার ডিভোশন। গড! এমন মানেও হয়?

লোকটা ফিক করে হাসল। বলল, "আমাদের ডিভোশনটাই আমাদের ঈশ্বর। সম্পূর্ণভাবে সেটা দিতে পারলেই ঈশ্বরলাভ হয়। এর জন্য ম্যারাপ বেঁধে, টিভিতে আধ সেদ্ধ সেলেব্রিটি এনে আর রাতজেগে ঠাকুর না দেখলেও চলে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এতসব জানলে কেমন করে?"

লোকটা হাসল চওড়া করে। বলল, "আরে আমি জানব না! আমি তো পাগল। পাগলরা সব জানে। জ্যামিতি কে আবিষ্কার করেছে? একটা পাগল। সান সেন্ট্রিক সোলার সিস্টেম? আর-একটা পাগল। মাধ্যাকর্ষণ? খুব সেয়ানা একটা পাগল। ওথেলো কে লিখেছে? একটা দুষ্ট পাগল। রিলেটিভিটির থিয়োরি? সেও একজন ব্যর্থ বিজনেসম্যান পাগল। সবটাই তো পাগলের কাজ ভাই। তাই একটা লম্বা সাধুবাবা টাইপ পাগল লিখেছিল পাগলে-পাগলে খেলা। গোটাটাই তো তাই। আমার ছোট্ট দশবছরের ছেলেটা আর শান্ত বউটা যদি গাড়ি চাপা পড়ে না মারা যেত, তবে কি আর আমি এতকিছু জানতে পারতাম? পারতাম না। তবে? তুমিও পারবে। কষ্ট পেতে-পেতে দেখবে একদিন সব কেমন সহজ হয়ে গিয়েছে। সব কেমন হালকা আর শান্ত হয়ে গিয়েছে। সব চলে গিয়েছে শুধু ওই গড পড়ে আছে। সেদিন তুমি সবটা পারবে। ততদিন একটু ধৈর্য আর কষ্ট করতে হবে। তবেই দেখবে জীবনটা শীতের রাতে হঠাৎ পাওয়া গরম কফির কাপ হয়ে গিয়েছে।"

"কফির কাপ?" কীসব বলছে লোকটা? এ আসলে কে?

"ভাল কথা। একটা তিনটাকার নোট হবে?" পাগলটা হঠাৎ সিরিয়াস মুখ করে বলে উঠল।

"তিনটাকার?" আমি হাসলাম, বললাম, "না, আমার কাছে সাত টাকার একটা নোট আছে।"

"অ্যাঁ?" এবার লোকটা যেন একটু থমকে গেল, "সাত টাকার? কিন্তু আমার কাছে যে চার টাকার নোট এখন নেই..." তারপর বলল, "দরাদরি করতে মোটেও ভাল লাগে না আমার। কিন্তু এমন যুগ পড়েছে, দরাদরি না করে কিছু করার উপায় নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে তোমার কথাও রইল, আমার কথাও রইল। দাও, আমায় পাঁচটাকাই দাও।"

আমি একটা পাঁচটাকার নোট বের করে লোকটাকে দিলাম।

লোকটা টাকাটা হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, "থ্যাঙ্কস। শুধু মনে রেখ, গড ইজ ইম্পরট্যান্ট। কোনও কিছুতে ডিভোশন দিলে তা বিফলে যায় না। সময় লাগে হয়তো, কিন্তু সেই কাজ সফল হয়ই। শুধু আশা ছেড়ো না। ডোন্ট গিভ আপ হোপ। বিকজ, দ্যাট্স আওয়ার ওনলি চান্স।"

বিকেলের কমলা রোদে লোকটার ঘন খয়েরি ছায়াটাকে আমার খুব লম্বা মনে হল। খালি পায়ে মেটে ধুলোর উপর হাঁটছে মানুষটা। যেন এক দরবেশ। যেন পৃথিবীর থেকে দূরে অন্য-কোনও কক্ষপথে মানুষটার যাত্রা। অন্য-এক আলোর সন্ধান যেন পেয়ে গিয়েছে সে। সেজন্যই বোধহয় তার আর অন্য-কোনও অশান্তি নেই। ইশ, ওর জন্য কিছু করতে পারতাম! স্ত্রী, সন্তান হারানোর শোকেই কি পাগল হয়ে গিয়েছে মানুষটা? হতেই পারে। যে হারায়, সে-ই জানে তার যন্ত্রণা। সে-ই জানে একজনের চলে যাওয়া কতটা খালি আর তুচ্ছ করে দেয় এই বেঁচে থাকা। আমি মনে-মনে ঠিক করলাম, পরের দিন এখানে এলে লোকটার জন্য কিছু জামাকাপড় অন্তত আমি নিয়ে আসবই।

মোবাইলটা আমি সারাতে দিয়েছি গতকাল। হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। তাই সঙ্গে নেই ওটা। আমি ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমার মাথা যেন আর কাজ করছে না! বিকাশ আমায় যে সাতদিন সময় দিয়েছে, সেটা মনে পড়তেই আবার অস্থির লাগল। কীভাবে এর সমাধান করব আমি?

আজ আর কলকাতায় ফিরব না। বাড়িতে বাবার কাছে একটু কাজ আছে। শুনেছি গতকাল বাবার প্রেশারটা আবার বেড়ে গিয়েছিল। আজকাল বাবার যে কী হয়েছে! বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই বোধহয় কমে যাচ্ছে। বোন গতকাল বলছিল ওই ধার নেওয়া টাকাটার জন্য খুব চাপ দিচ্ছে সুদখোর লোকটা। বোনের ধারণা জেঠু লোকটাকে খেপাচ্ছে। যাতে আমরা জেঠুদের থেকে যা টাকা পাই তাতেই জমিটা দিই। কিন্তু বাবা নাকি এটা বিশ্বাস করে না। বাবার এখনও ধারণা যে, এমনটা জেঠু করতেই পারে না। আমি বলেছি জেঠুর সঙ্গে নিজে কথা বলব, কিন্তু বাবা দিব্যি-টিব্যি দিয়ে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার করে দিয়েছে। বাবা কেন যে আমায় জেঠুর সঙ্গে কথা বলতে দিতে চায় না! বাবার ধারণা জেঠুকে আমি খুব অপমান করব। আজ গিয়ে ভাবছি বাবার সঙ্গে কথা বলব আবার। বোঝাব যে, জেঠুর সঙ্গে আমার কথা বলাটা জরুরি।

বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম ছ'টা বেজে গিয়েছে। দেখলাম বাড়ির সামনের মাঠটার এক কোণে একটা ইজিচেয়ার নিয়ে বসে রয়েছে বাবা। বোনও আছে পাশে। দেখে বুঝলাম এইমাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে ও। আমায় দেখে বাবা উঠল চেয়ার থেকে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সামান্য। তারপর ঘরের ভিতরে চলে গেল। আমার অবাক লাগল বেশ। বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার রে?"

বোন সময় নিল একটু। তারপর বাবা যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে বলল, "আরে সেই লোকটা এসেছিল একটু আগে। খুব খারাপ কথা বলে গিয়েছে। টাকা দিতে নাকি পারব না আমরা। জেনেশুনেই নাকি টাকাটা মারব বলে নিয়েছি। এখন বাড়িটা ছাড়তে হবে আমাদের। কারণ তুই যে বিয়ে করবি না, সেটা ও বুঝে গিয়েছে। আরও সব খারাপ কথা বলেছে। বাবা তাই একটু আপসেট হয়ে আছে।"

আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, "ব্যাটা এসব বলে গিয়েছে! দাঁড়া, আজ যাব আমি। গিয়ে কথা বলব। করত তো ছাঁট লোহার দালালি, তার এত বড়-বড় কথা কীসের? আর দেখবি জেঠুর সঙ্গেও কথা বলব। বলব ওসব কাঠি করে লাভ হবে না কোনও। দরকার হলে যারা জমিটা কিনছে তাদের সঙ্গেও দেখা করব।"

বোন বলল, "জানিস দাদা, সেদিন ওই যারা জমিটা কিনতে চায় তারা এসেছিল। আমি আর বাবা আসছিলাম তখন মাঠ দিয়ে। একটা মেয়ে আর বয়স্ক করে দেখতে একজন ভদ্রলোক। কী সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। আমাদের ঘুরে দেখেছিল মেয়েটা, জানিস?"

আমি বললাম, "কথা বলতে পারলি না গিয়ে? কী যে করিস না!"

"কথা তো বলতাম আগে জানলে। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম কী কেস।"

"আর পরে বুঝলি!" মাথা নাড়ালাম আমি। ধরে আছে খুব মাথাটা। একটার পর একটা ঝামেলা। সব সমাধান হয়ে যায় যদি টাকাটা জোগাড় করে মালটার প্রথম লটটা সাপ্লাই করে দিতে পারি। কিন্তু কোথায় পাব ওই টাকা?

বোনকে বললাম, "একটু কড়া করে চা কর না রে। মাথাটা ছিঁড়ে এবার মাটিতে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে।"

বোন বলল, "যখন তুই এমন করে বলিস, তোকে পুরো বাবার ইয়ং বয়সের ছবির মতো দেখতে লাগে। সত্যি, তোর সঙ্গে কিন্তু বাবার খুব মিল!"

"তাই? জানিস তো পিতার মতো দেখতে পুত্রদের কপালে দুঃখ থাকে!"

বোন কিছু বলতে গিয়েও যেন থমকাল। আমার কাঁধের পিছন দিয়ে যেন দেখল কাউকে। তারপর হাসল সামান্য! কে এল?

আমি পিছনে ঘুরে অবাক হয়ে গেলাম খুব। ও এসেছে? এখানে? কেন?

"তুমি গুরু আর মানুষ হবে না। মাইরি, সত্যি বলছি, কেউ মানুষ করতে পারবে না তোমায়। শেষে তোমার পাশের ফ্ল্যাটের ওই সেক্সি বউদির বরের থেকে এসব শুনতে হবে আমায়? তার কাছে তুমি টাকা চাইতে গিয়েছিলে কেন? আমি কি মরে গিয়েছি? আমার কথা কি মনে পড়ল না তোমার? তোমায় রাগ করে কিছু বলতেও পারব না আমি? সে অধিকার নেই? কে বলেছে তোমায় রাস্তার লোকের থেকে টাকা ধার করতে? কে বলেছে? আমায় বলতে পারলে না তুমি সমদা? আমায় তুমি নিজের ভাব না? আমি কি তোমার ছোটভাই নই?"

বড় মাঠটার ভিতরে গুটি-গুটি পায়ে সন্ধে নামছে এখন। নরম হাওয়া দিচ্ছে। গঙ্গার থেকে মন কেমন করা একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে মফস্সলের ছোট-ছোট বাড়িগুলোর চোখে-মুখে। তার ভিতরে দাঁড়িয়ে দেখলাম পিঁড়ি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর ওর চোখে কী যেন নেমে এসেছে সন্ধ্যাতারার মতো দু'ফোঁটা আলো। ভাই-বন্ধুর মতো ভরসার এক আলো!

৪

'For if I ever saw you
I didn't catch your name
But it never really mattered
I will always feel the same

Love you forever and forever
Love you with all my heart
Love you whenever we're together
Love you when we're apart

And when at last I find you
Your song will fill the air
Sing it loud so I can hear you
Make it easy to be near you
For the things you do endear you to me
Oh, you know, I will
I will
(আই উইল, দ্য বিটল্‌স)

লরির ভিতরটা বেশ ছোট। কেমন যেন দম চাপা ভাব। পাশে বসা ড্রাইভারটির গা থেকে কড়া বিড়ির গন্ধ আসছে। লরির ছোট জানালা দিয়ে ধুলো আর হাওয়ার মিশ্রণ এসে জড়িয়ে আছে আমার মুখে আর মাথায়। একটা চিটচিটে ঘাম বাব্‌লগামের মতো জড়িয়ে আছে শরীরে। তবু, তবু আজ খুব গান পাচ্ছে আমার। মাথার ভিতরে একটা ছেলে বহুদিন পর জেগে উঠেছে গিটার হাতে। আজ আবার কলেজের মাঠটা দেখতে পাচ্ছি যেন। বিকেলের কমলা হাওয়াটাও যেন টের পাচ্ছি শরীরের ভিতরে। আর দেখতে পাচ্ছি তাকে।

আমাদের যে-কোনও দুঃখ যেমন প্রিয় মানুষকে মনে পড়ায়, তেমন স্বস্তিও সেরকমই কিছু মনে পড়ায় কি? হয়তো পড়ায়। না হলে আজ লরিতে ওঠা ইস্তক কেন বারবার মনে পড়বে বোবোকে? হ্যাঁ, আজ আমার একটু স্বস্তির দিন। হালকা মনে হওয়ার দিন। কারণ আজ আমি ওই থ্যাচ্‌ড রুফের প্রথম কনসাইনমেন্ট ডেলিভারি করতে যাচ্ছি আর্কটিক ভিলেজে। এসময় এদিকটায় নো এন্ট্রি থাকে বলে, সকাল-সকাল ড্রাইভার আক্রার কাছে লাগিয়েছিল লরিটা। তারপর আমি ট্রেনে করে গিয়ে আড়াইটে নাগাদ গাড়িতে উঠেছি আক্রা থেকে। আমার অবশ্য ভয় ছিল যদি পুলিশে ধরে! কিন্তু ড্রাইভার মুকুল বলেছে যে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিন-চারটে দশটাকার নোট রেডি রাখলেই হবে।

আমার মাঝে-মধ্যে মনে হয় আমাদের দেশে টাকার চেয়ে ভাল চাবি কিচ্ছু নেই। আমরা আর কিছু চিনি না। তা মুকুল বয়সে নবীন

হলেও অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট নামকরা এক ময়রা। দশটাকার জাদু আমি ওঠার পর থেকে দু'বার দেখেছি। সমস্ত 'নো এন্ট্রি'-কে 'ইয়েস এন্ট্রি' করে দিতে এর মোটেও সময় লাগেনি। আর যত বেশি সেই চাবি কাজ করছে আমার ভিতরে তত বেশি করে যেন জেগে উঠছে পুরনো সেই গিটার-পাগলাটা। আর আমি স্থান-কাল-অপাত্র ভুলে গেয়ে চলেছি গান। বিটল্‌সের গান।

"এসব কী গাইছেন?" মুকুল পাশ থেকে বলল আমায়, "ইংরেজি গান কেউ গায়?"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আরে ফালতু গান। কথা বোঝা যায় না। জড়িয়ে-জড়িয়ে প্রেমের কথা বলছে না খিস্তি করছে কিছু বোঝা যায় না। শুধু চুল ঝাঁকায় আর গিটার নিয়ে চ্যাঁই-চ্যাঁই করে। তবে একটা ভাল জিনিস আছে।"

"ভাল জিনিস আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কীরকম ভাল জিনিস?"

"প্রায় ন্যাংটো মা... ইয়ে মেয়েছেলে দেখা যায় ওদের গানে। আমার তো হেব্বি লাগে দেখতে।"

আমি হাসলাম, "সব গানে কিন্তু তেমন হয় না।"

"তাই তো ফালতু বলছি। মেয়েছেলে দেখলে না হয় কথা ছিল। বাকি ওই জান্তুবানের মতো চুল ঝাঁকালে কার ভাল লাগে! তা দাদা, আপনি সলমন খানের ছবির গান গাইতে পারেন? 'হুর হুর দাবাং দাবাং দাবাং'। পারেন?"

"অতটা এখনও পারি না," আমি কুণ্ঠিত গলায় বললাম।

"তা হলে আর কী করতে পড়াশোনা করলেন!" মুকুল আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আবার রাস্তায় মন দিল।

সত্যি, আমি যে কী করতে পড়াশোনা করলাম! না ভাল চাকরি পেলাম। না ভাল কোনও ব্যবসা করতে পারলাম। আর না সলমন খানের গান শিখলাম। পড়াশোনার সঙ্গে আমার যে জীবনটাও বৃথা তা মুকুল তার কথায় জানিয়ে দিল আবার।

হাসি পেল। সত্যি হাসি পেল আমার। তবে তার সঙ্গে আবার স্বস্তিটাও ফিরে এল। কারণ শেষমেশ আমি পারলাম প্রথম লটের মালটা সাপ্লাই করতে। শুধু... আমার মনে ছোট্ট একরত্তি একটা 'কিন্তু' জলের তলার থেকে আচমকা ঘাই দেওয়া মাছের মতো জেগে উঠল। প্রথম লটের মালের থেকে দশটা কৃত্রিম টালি কম আছে। কারণ ওগুলোয় ডিফেক্ট ছিল। তাই বিউটি রুফের লোকজন নিজেরাই ওগুলো বাতিল করে বলেছে যে, পরের লটে পুষিয়ে দেবে। তবে আমার মনে হয় বিকাশ সেনাপতি এই নিয়ে ঝামেলা করবে না। কারণ একলরি মাল তো পেয়েছে। মোটে দশটা টালি কম হলে সমস্যা কীসের!

সমস্যা তো ছিল। অনেক-অনেক সমস্যা ছিল। বাবার শরীর খারাপ, গজার মায়ের চিকিৎসা, সুদখোরের চাপ, কুসি বউদি, সব ছিল। এসব নিয়ে জীবন তো গভীর জঙ্গল হয়ে ঘিরে ধরেছিল আমায়। পথ কোথায় যে বেরব? আমার চারদিকে যেন রাতের জঙ্গল নেমে এসেছিল। কিন্তু আমার মধুসূদন দাদা যে পিঁড়ি। কোন জঙ্গল আমার কী করবে! সেদিন ওই বিকেল আর সন্ধের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছিলাম আলো। আর আমার অন্ধকার জীবন থেকে বেরোবার পথ আমি দেখেছিলাম সেই আলোয়।

আমি পিঁড়িকে নিয়ে ঘরে গিয়ে বসেছিলাম। বলেছিলাম, "এমন ইমোশন্যাল হচ্ছিস কেন? তুই তো সবসময় হেল্প করিস, আমি তোকে কতবার বলব আমার সমস্যার কথা?"

"সমদা তুমি এমন ডায়ালগ শিখলে কোথা থেকে? আমার কাছে লজ্জা? শালা, একসময় নেহাত পড়েছিলাম তোমার কাছে, না হলে কেলিয়ে তোমার চ্যাঙাব্যাঙা করে দিতাম একদম। আমার কাছে লজ্জা! হ্যাঁ?"

আমি পিঁড়ির হাত ধরে বলেছিলাম, "তুই মাথাটা ঠান্ডা কর একটু। এমন করিস না।"

পিঁড়ি পাত্তাই দেয়নি আমায়। বলেছিল "তোমার ইমিডিয়েটলি কত টাকা দরকার? শুনলাম তিনলাখ। তাই?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, "না, এখন দু'লাখ হলেই হবে। আমি বিউটি রুফের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের দু'লাখ টাকার ড্রাফ্‌ট দিলেই প্রথম লটের মাল পেয়ে যাব। আর তারপর পেমেন্ট পেয়ে সেকেন্ড লটের মালটা দেব।"

পিঁড়ি জিজ্ঞেস করেছিল, "তা তোমায় অর্ডারের সঙ্গে কোনও অ্যাডভান্স দেয়নি আর্কটিক ভিলেজ?"

আমি মুখ নামিয়ে বলেছিলাম, "দিয়েছে, কুড়ি হাজার টাকা। ওতে কী হবে? বলেছিলাম আর-একটু দিতে। ওরা বলল ওদের টাকায় কি ব্যবসা করব নাকি? ব্যবসা করতে হলে আমায় নিজের টাকাও তো লগ্নি করতে হবে, না? আর দ্যাখ, আমি নতুন কাজ করছি। আমায় হঠাৎ বিশ্বাস করবেই বা কেন?"

পিঁড়ি মাথা নেড়েছিল নিজের মনে। তারপর বলেছিল, "ঠিক আছে। তুমি কাল আমাদের দোকানে এসো। টাকা পেয়ে যাবে।"

"পেয়ে যাব মানে?" কী বলছে পিঁড়ি আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না।

"বাংলাটাও কি ভুলে মেরে দিয়েছ? পেয়ে যাবে মানে পেয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। বাবা বলেছে দেবে। কোনও ব্যাপার নয়। তুমি শুধু দোকানে যাবে। বাবা ক্যাশ দিয়ে দেবে।"

"ক্যা-ক্যাশ?" আমার কথা আটকে গিয়েছিল, "কেন দেবেন কাকু? আমি তো কোনওকিছু গ্যারান্টি রাখতে পারব না।"

"মাইরি আমার বাপ কড়া মানুষ হতে পারে, কিন্তু তবু মানুষ। জন্তু নয়। আর আমার বাপের টাকা কম আছে? সবসময় অমন ফতুয়া আর পাজামা পরে থাকে বলে লোকটাকে আন্ডার এস্টিমেট কোরো না। আসলে লোকটা টাকার কুমির। মানুষের ক্যামোফ্লেজে আছে।"

"সত্যি?" আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়েছিলাম পিঁড়ির দিকে।

পিঁড়ি বলেছিল, "সত্যি, তুমি জীবনকে উপন্যাস বানিয়ে ছাড়লে! প্রেমে আঘাত খাওয়া নায়ক। টাকার অভাবে ডুবতে বসা একটা জীবন। টাকা কোথায় পাবে বলে ছ'পাতার মোনোলগ। ন্যাতাপ্যাতা টেনশন। আরে বাবা সামনে সলিউশন থাকতে হেদিয়ে পড়লে একদম!"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, "জানিস, এটাতে প্রায় হাজার ষাটের মতো লাভ থাকবে। ফার্স্ট লটের থেকে। কাকুকে আমি পেমেন্ট পেলেই টাকা দিয়ে দেব।"

"চেয়েছি আমি টাকা? গোটা কাজটা হলে দেবে। আর কত লাভ করবে, সেটা আমায় কেন কাউকে বলার দরকার নেই। এমন হরিশ্চন্দ্র হলে তো দেখছি ব্যবসায় দু'দিনেই লালবাতি জ্বালিয়ে দেবে।"

বোন দরজা থেকে এগিয়ে এসেছিল এবার। হেসে বলেছিল, "যাঃ, তোর তো প্রবলেমই মিটে গেল। তা সেই সুদখোর ব্যাটার মেয়ের বিয়ের কী হবে? সে তো ভেবেছিল তোকে জামাই করবে!"

আমায় কিছু বলতে না দিয়ে পিঁড়ি মাঝপথ থেকেই কথাটা তুলে নিয়েছিল, "ওরে কাকা, এর ভিতরে এমন ব্ল্যাকমেলিং টাইপের বিয়ের অ্যাঙ্গলও ছিল! বোঝো! দায়িত্ব নিয়েই তো নিজের পিছনে বাঁশ দেওয়ার প্রকল্প নিয়েছিলে দেখছি! তা বিয়ে করলে তোমার মজদুর ইউনিয়ন টাইপের সেই প্রেমটার কী হত?"

আমি পিঁড়ির হাত ধরে বলেছিলাম, "আর লজ্জা দিস না ভাই।"

পিঁড়ি বলেছিল, "লজ্জা নয় গো দাদা, লজ্জা নয়। এমন প্রেমের স্বপ্নই তো সকলে দ্যাখে। কিন্তু ক'জন তোমার মতো ভালবাসতে পারে সমদা? এমন একাগ্র, এমন স্বার্থহীন! ক'জন পারে? প্রেম তো এমনই হওয়া উচিত। সবকিছু ছাড়িয়ে তার তো এভাবেই মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত। সত্যি, মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!"

তিনটে কুড়ি নাগাদ আর্কটিক ভিলেজের ভিতর লরিটা ঢুকিয়ে দিল মুকুল। গেটে দারোয়ান ছিল। সে দেখিয়ে দিল সামনে যে-তিনতলা বিল্ডিংটা আছে, তার পিছনদিকে অস্থায়ী গোডাউন করা হয়েছে। ওখানেই মাল থাকবে। তাই লরিটাকে আপাতত তিনতলা বিল্ডিংটার সামনে রাখতে হবে। মুকুল সেদিকে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে-যেতে

বলল, "দাদা, মাল আনলোড কে করবে? আপনি তো কাউকে নিয়ে এলেন না।"

আমি বললাম, "আরে এখানে অনেক লেবার আছে। তারা করে দেবে।"

"আপনি তো বলছেন। কিন্তু যদি না করে? অনেক মাল আছে। আমি কিন্তু হাত লাগাব না। আমি ড্রাইভার, কুলি নই। বুঝলেন?"

আমি কথা না বাড়িয়ে চালান নিয়ে লরির দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে নামলাম। আমায় দেখে একজন ভিতরে যে বিকাশকে খবর দিতে গিয়েছে, তা নেমেই বুঝতে পারলাম।

লরির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কার্ডবোর্ড কভারে প্যাক করা আছে মাল। আর তার উপরে প্রোটেকশনের জন্য প্রায় দু'ফুট উঁচু করে খড় বিছানো। খড়ের উপর একটা ত্রিপল ঢাকা। এটা আমি নিজে করিয়ে এনেছি। আসলে দরকার ছিল না। কিন্তু আমি কোনওরকম চান্স নিতে চাই না। আমার প্রথম এতবড় অর্ডার। এই প্যাকিংয়ের জন্য আমায় দেড়হাজার টাকা বেশি দিতে হয়েছে। হোক, মালটা তো ঠিকমতো পৌঁছবে।

"এসে গিয়েছেন?" আমি লরির সামনের দিক থেকে বিকাশের গলা শুনলাম।

হেঁটে আমি বিকাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "হ্যাঁ, যা সময় দিয়েছিলেন তার দু'দিন আগেই আমি এসে গিয়েছি।"

"তা মাল সব ঠিক এনেছেন তো?"

আমি চালানটা খাম থেকে বের করে বিকাশের দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, "হ্যাঁ, মোটামুটি।"

বিকাশ চালানটা নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থমকাল। তারপর একদিকে তাকাল। আমি ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে দেখলাম, খুব ফরসা, সুন্দর দেখতে সেই লোকটা কোনওদিকে না তাকিয়ে গটগট করে চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। লোকটার মুখ-চোখ লাল। সাদা শার্টটা কেমন যেন এলোমেলো। দেখে কেমন যেন অস্বস্তি লাগল আমার। মনে হল মানুষটা রেগে আছে খুব। লোকটা চলে যাওয়ার পর শুনলাম বিকাশ নিজের মনে বলল, "সেরেছে! সামনে দিয়ে না উঠে একদম পিছনের গেট দিয়ে হামলা!"

"অ্যাঁ?" আমি কিছু না বুঝে ওর দিকে তাকালাম।

"আপনাকে বলিনি। এটা আমাদের এখানকার ব্যাপার। আপনার নয়," বিকাশ আমায় বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে চালানে মন দিল। এই বিকাশ লোকটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এই ভাল তো এই খারাপ। এই আমার জন্য উপরের বসের কাছে যাচ্ছে, তো পরেই আবার আমায় ঝাড় দিচ্ছে! কী চায় লোকটা? স্পষ্ট করে যারা কথা বলে না তাদের নিয়ে খুব ঝামেলা।

"আপনি মোটামুটি বললেন কেন?"

আমি থমকালাম। আমার ছোট্ট যে-টেনশনটা ছিল, সেটাই কি ঠিক হতে যাচ্ছে নাকি! ওই দশটা টাইল কম আছে বলে সেটা নিয়ে ঝামেলা করবে নাকি!

বললাম, "আসলে মাত্র দশটা থ্যাচড টাইল কম আছে। ওরা প্যাক করার আগে দেখেছে যে, ওগুলোর কাটিংটা ডিফেকটিভ। তাই সরিয়ে রেখেছে। সেকেন্ড লটে ওগুলো পেয়ে যাব।"

"এটা কি মামার বাড়ি নাকি?" বিকাশ ফোঁস করে উঠল, "কম এনেছেন কেন? অর্ডারে ডেলিভারি শেডিউল আর কোয়ানটিটি স্পষ্ট বলা ছিল। আপনি ভায়োলেট করলেন কেন?"

"দেখুন," আমি শান্তগলায় বোঝানোর চেষ্টা করলাম, "আমি বলছি তো, মাত্র দশটা টাইল। মানে একটা প্যাক। আমি পরের লটেই তো এনে দেব। তেমন হলে তার টাকা কেটে আপনি আমায় পেমেন্ট করুন।"

"তেমন হলে মানে? তেমন তো করতেই হবে। মাল কম আর পুরো টাকা দেব? তাছাড়া, আগে আমি সব চেক করব, তারপর এই চালানে সই করব। দশটা ডিফেকটিভ ছিল। যদি আরও কয়েকটা বের হয়, তখন? কে রিস্ক নেবে?" বিকাশ তড়বড় করে বলল।

"তেমন হবে না। আপনি বিশ্বাস করুন।"

"এটা বিশ্বাসের ব্যাপারই নয়। না দেখে আমি মাল নেব না। আমি লোক দিচ্ছি, ওরা ওই খড় নামিয়ে দিচ্ছে। আপনি লরিতে উঠে মাল খুলে দিন। আমি দেখব।"

আমি কী করব বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকালাম।

"কী হল?" বিকাশ ঝাঁঝিয়ে উঠল, "মাল ঠিক থাকলে পরশু পেমেন্ট পেয়ে যাবেন। কিন্তু আগে আমি দেখব। যান, উঠুন লরিতে।"

বিকাশের ইশারায় চারজন লেবার লরির দিকে এগোল। আমি বুঝলাম আর উপায় নেই। ঘড়ি দেখলাম আমি। এখনই সাড়ে তিনটে বাজে। এসব শেষ করে কখন ফিরব বাড়িতে? কাজ নিয়ে তো আচ্ছা বিপদ হল!

"কী হল? এগোন," বিকাশ এবার খিঁচিয়ে উঠল।

আমি মাথা নেড়ে পা বাড়ালাম লরির দিকে। আর ঠিক তখনই, কী যেন একটা হল! উপর থেকে সাঁ করে শব্দ শুনলাম আমি। তারপরই শুনলাম, ধপ্। দেখলাম আমার সামনের লেবারগুলো কেমন যেন থতমত খেয়ে পিছিয়ে এল। আর লরিটা, ভূমিকম্পের ঢেউ লেগেছে এমন করে নড়ে উঠল খুব।

ব্যাপারটা কী? আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই মনে পড়ল, আমার মালপত্র! আরে কী পড়ল লরিতে? মালের ক্ষতি হয়ে গেল কি? উপর থেকে পাথর বা সিমেন্টের চাই-টাঁই কেউ ফেলল নাকি? সর্বনাশ, দু' লাখ টাকার মাল! আমি যে পথে বসব! কী হবে আমার?

দৌড়ে গিয়ে আমি লরির পিছনের ডালাটা ধরে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে উঠলাম খড়ের ওপর।

এ কী! কে এটা? অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খড়ের ওপরে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। ছোট করে কাটা চুল। হাত টোনো জামা। মুখটা অন্যদিকে ফেরানো।

এই সেরেছে? এ কোথা থেকে পড়ল? আজকাল আকাশ থেকে মেয়ে পড়ছে নাকি! আর নড়ছে না কেন মেয়েটা? গেল নাকি? বেঁচে আছে তো? খড়ের উপর তো পড়েছে, তাতেও কি বেকায়দায় লেগেছে?

আমি ডাকলাম, "শুনছেন? হ্যালো? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?"

আমি দেখলাম মেয়েটি নড়ছে এবার। লরির নীচে হইচই হচ্ছে। ভিড় জমছে।

আমি আরও একটু এগোলাম, "শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো?"

মেয়েটা এবার আলতো করে উঠে আমার দিকে পেছন করে বসল।

"ঠিক আছেন তো আপনি? লাগেনি তো?"

"না, লাগেনি," মেয়েটা এবার ঘুরে বসল আমার দিকে।

বহুদিন আগে একটা কলেজের রুম ছিল। সেখানে সবার পেছনে বসে একটা ছেলে হিজিবিজি ভিড়ের মধ্যে দেখেছিল অদ্ভুত এক নীল সালোয়ার। দেখেছিল হাওয়ায় অল্প-অল্প করে দুলছে তার সাদা শিফনের ওড়না। দেখেছিল ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়া চুল, ভুরুর উপর তিল আর ছোট্ট বুগনভেলিয়ার পাপড়ির মতো ঠোঁট। ছেলেটা বুঝেছিল কোথায় যেন একটা নদী ভেঙে পড়ল পাহাড় থেকে। মাটি-পাথরের পায়রারা সব প্রাণ পেয়ে উড়ে গেল সাদা-নীল আকাশে। মাঝরাতে একলা পথিকের মাথার উপর কোথায় যেন ঝরে পড়ল জ্যোৎস্না! ছেলেটা বুঝেছিল, এই সেই মেয়ে, যার জন্য সারাজীবন অপেক্ষায় থাকা যায়।

সারা জীবন। কতটা বড় হয় একটা বেঁচে থাকা? ক'বার পাওয়া যায় এই জীবন? কার জন্য আমরা সেই একবারের সুযোগটাকেও হেলায় সরিয়ে রাখি? কার জন্য সারাজীবন উন্মুখ হয়ে বসে থাকি? কার জন্য? সে কি তোমার জন্য রাজকন্যা? তোমার জন্য?

"তুই?" বোবো পাথরের মতো হয়ে গিয়েছে যেন, "সম, তুই?"

আমার জিভ নড়ছে না। চোখের পাতা পড়ছে না। শ্বাস নিতেও

যেন ভুলে যাচ্ছি। শুধু চোখ দু'টো জ্বালা করছে হঠাৎ। বলতে ইচ্ছে করছে, "হ্যাঁ আমি, আমিই তো। কে আর হবে বল? তুই যখন পড়ে যাবি, তখন আর কে থাকবে তোর কাছে? কে আসবে তোকে তুলে ধরতে? কে জানতে চাইবে তোর লেগেছে কি না! কে? বল বোবো, এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কে আছে তোর ব্যথার বন্ধু?"

বোবো আচমকা দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর কোনওমতে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। কলার ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "কেন তুই এখানে? কী করছিস? চলে তো গিয়েছিলি, তা আবার ফেরত এলি কেন? কেন এলি ফেরত? বল, বল। কে সাহস দিয়েছিল চলে যাওয়ার? কে সাহস দিল আবার আসার? কে দিল সাহস? বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে উত্তর দে, দে উত্তর।"

লরির নীচে তখন জটলা, হইচই। কারা সব চিৎকার করছে? কারা সব উঠে আসছে লরির উপর? কারা হাত ধরে তুলছে আমাকে? বোবোকে? এরা কারা? আসলে আদৌ কি কেউ আছে আমাদের চারপাশে? কেউ কি কোনওদিনও ছিল? জলে ধুয়ে যাচ্ছে সব। সব ক্রমশ মিশে যাচ্ছে একে অপরের সঙ্গে। পুরনো সময় এসে থেমে যাচ্ছে নতুন সময়ে। পুরনো হাত এসে মিশে যাচ্ছে নতুন হাতে। বহুদিন আগের একটা আবছা হয়ে আসা বিকেল ঘুরে এসে মিশে যাচ্ছে নতুন এই বিকেলের সঙ্গে। সম্পূর্ণ হচ্ছে অপেক্ষা। ডায়েরির পিছনে ফেলে রাখা আধভাঙা চাঁদের বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে আজ!

তারপর

যেন তুলোর বল লাফিয়ে পড়ল আমার উপর আর অবাক হয়ে দেখলাম তার ছোট্ট গুলির মতো চোখদু'টো কী দারুণ চকচক করছে! আমি বিছানা থেকে আমার ঘরটা দেখলাম। জানালাগুলো সব বড়-বড় নীল পরদা দিয়ে ঢাকা। আর তার থেকে আসা আলতো আলোয় কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সব! ঘরের পাশেই একটা চওড়া ব্যালকনি। সেই ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবো। আমারই একটা বড় সাদা শার্ট পরে রয়েছে ও। যদিও মোমের মতো পা দু'টো নিরাভরণ। শুধু লম্বা ঝুলের শার্টটা নেমে আছে থাই অবধি। আমার যে কী ভাল লাগছে ওকে দেখতে! বোবোর হাতের কফি মাগ, তার থেকে ভেসে ওঠা নরম ধোঁয়া জড়িয়ে যাচ্ছে ওর ঘাড়ের উপর ভেঙে পরা আলতো চুলের গোছায়। এই মেয়ে কোন পৃথিবী থেকে এল আমার কাছে? কেন এল আমার জীবনে? কেন এমন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়!

আমি চোখ না সরিয়ে তাকিয়ে রইলাম বোবোর দিকে। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে, একটা ভাঁজ করে পা তুলে হাতে কফি মাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবো। ওর ওই ছোট্ট ঠোঁটদুটো দিয়ে অল্প-অল্প চুমুক দিচ্ছে কফিতে। বড়-বড় চোখগুলো কী এত দেখছে বাইরের দিকে তাকিয়ে?

আমার রাগ হচ্ছে! কী আছে অত বাইরে যে অমনভাবে তাকাতে হবে? আমি কি কেউ নই? আমার দিকে না তাকিয়ে কী এত দেখছে বোবো? কী দেখছে ও? স্বপ্ন?

স্বপ্ন। জীবন আসলে স্বপ্ন দেখারই একটা প্রক্রিয়া। ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবো। হাতে কফি মাগ। আমার বড় একটা শার্ট ওর গায়ে। মেঝেতে ওই তো লাফাচ্ছে বিটল্‌স। ওই তো খয়েরি রঙের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে বোবোর চুলের বাঁকে।

এসব কি সত্যি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ খুলব। খুললেই ভেঙে যাবে না তো স্বপ্নটা? গেলে কী হবে? আবার কি বৃত্ত সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন করে দেখতে হবে স্বপ্ন?

আমি চোখ খুললাম। স্বপ্ন চলছে। এই লেখার থেকে বেরিয়ে আমার জীবনে ঢুকে পড়ছে স্বপ্ন। আমার জীবন থেকে বেরিয়ে সে পৌঁছে যাচ্ছে তোমার চোখে। তোমার বন্ধুর চোখে। নানান চোখে। নানান ইচ্ছের মধ্যে, চেষ্টার মধ্যে আর ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে স্বপ্ন!

তুমি কি আমায় ড্রিমার বলবে? বলবে, বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ? স্বপ্নদর্শক? যাই আমায় বলো না কেন, জানি, আমি একা নই। জানি মনে-মনে তুমিও আমারই মতো। কারণ তোমারও যে আমার মতো আশা ছাড়া, স্বপ্ন আর কিছু নেই। কারণ সব বৃত্তের শেষে দাঁড়িয়ে তুমিও তো বলতে চাও...

'Who knows how long I've loved you
You know I love you still
Will I wait a lonely lifetime
If you want me to, I will.'

(এই গল্পে, বিটল্‌স ছাড়া আর সবকিছুই বানানো)

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র